Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রবন্ধ

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	July 8, 2025
DOI	10.62328/sp.v32i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.7
Pages	109-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রবন্ধ

সৈয়দ আজিজুল হক

বাংলা প্রবন্ধের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে একটি জাতির সামগ্রিক উজ্জীবন ও কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত ছিল। বাঙালি জাতির শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনভাবনা তথা তার সমগ্র চিন্তা ও চেতনাজগৎকে মধ্যযুগীয় স্থবিরতা ও স্পষ্টতার অন্ধকার থেকে সংস্কারমুক্ত, আলোকময় ও গতিশীল করে আয়ত-দৃষ্টি দানের প্রয়োজনটি উনিশ শতকের সূচনাকালের প্রাবন্ধিকদের সামনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সৃজনশীল শিল্প-প্রয়াসের পাশাপাশি মননশীল ও গবেষণাধর্মী এ-বিশ্লেষণী ধারাটি সমান্তরাল-ভাবে বিকশিত হয়েছে এবং বাঙালির সমাজ-চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের স্মরণীয় প্রতিভাবানদের সৃষ্টি-কর্মে যুগপৎ উভয় ধারার সমান ও সার্থক বিকাশও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা প্রবন্ধের এ-দ্বিবিধ প্রবণতা বাংলাদেশের প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সমানভাবে স্পষ্ট। অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌মুখিতার দ্বন্দ্ব ও সংক্ষোভ উভয় পর্বে একই মাত্রায় বর্তমান থাকলেও বাংলাদেশের প্রবন্ধের সূচনাপর্বে পশ্চাদ্‌গতির বিভ্রান্তি ও মোহময়তা অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে এ বিভ্রান্তি থেকে যে-স্বল্প কয়েকজন প্রাবন্ধিক আদ্যোপান্ত মুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-৮৮) নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে স্বল্পশিক্ষিত ও মাদ্রাসাউত্তীর্ণ হয়েও স্বচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন-স্পৃহা ও একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে কিভাবে সর্বাংশে একজন মধ্যবিত্ত-প্রতিনিধি ঐতিহ্যবিবর্জিত পরিবেশেও একটি জাতির চূড়াস্পর্শী শিল্পবোধ ও মানবিক-চেতনা এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মনীষার অধিকারী হতে পারেন, আবু জাফর শামসুদ্দীন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের সামন্তমনস্ক শাসকশক্তি ও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াপন্থী কূপমণ্ডূক ধর্মজীবীগণ স্বার্থতাড়িত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের জাতীয় চেতনা-বিরোধী যে বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতির বিষবাষ্প উদ্‌গীরণ করেছে, তা আবু জাফর শামসুদ্দীনের বিজ্ঞানসম্মত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ও জনকল্যাণসতর্ক চৈতন্যকে নির্মমভাবে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করেছে। একান্তভাবে সমাজমনস্ক, সমকালস্থিত এ-প্রতিভা পাকিস্তান-নির্মাণের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ত্রুটি, এর কারিগরদের লোকবিরোধী অধর্মাচরণ এবং বাঙ্গালি মুসলিম নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও অদূর-দর্শিতা সম্পর্কে পূর্বাপর এতই সজাগ ছিল যে, তাঁর পক্ষে সৃজনশীল সৃষ্টি-কর্মের নিরাসক্ত ব্রতে স্থির থাকা সম্ভব হয়নি। ফলে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যিনি স্বীয় মানবীয় বোধ ও আবেগ-অনুভূতিকে সৃষ্টিশীলতার আলো-অন্ধকারে মোড়ক-আচ্ছাদিত করার আনন্দে ছিলেন স্থিত, ষাটের দশক থেকে প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনিই হয়ে উঠলেন বিশ্লেষণউন্মুখ, যুক্তিবাদী ও ইতিহাস-অন্বেষী। পরবর্তীকালে সৃজনশীলতাকে উপেক্ষা করেননি, কিন্তু হৃদয়ধর্ম অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠা, সৃজনের আনন্দ অপেক্ষা দায়িত্বের গুরুভারও তাঁর কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়নি। ব্যক্তিজীবনাচরণের ন্যায় রচনায়ও তিনি আমৃত্যু সমান আন্তরিক, পক্ষপাতশূন্য, স্বীয় উপলব্ধির প্রতি সততার সঙ্গে একনিষ্ঠ।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে যখন তিনি প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁর শিল্পী-মানস ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্যীয় ও ইউরোপীয় ইতিহাস-ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত বিস্তৃত অধ্যয়নের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও পরিণত। এই প্রাজ্ঞতার স্পর্শ তাঁর রচনাকে করেছে শাণিত ও লক্ষ্যভেদ্য। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্যের যুক্তিও তাই এ মানদণ্ডে বিচার্য। কেবল শিল্পসাহিত্য বিশ্লেষণেই নয়, তার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে সমাজ, রাজনীতি এবং ধর্ম ব্যাখ্যাতেও। সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম-মানসকে সংস্কারমুক্ত, আলোকিত, জাগ্রত ও যথার্থ পথ-অনুসারী করার আন্তর্গরজই পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধসমূহে।

সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন তিনি কলাকৈবল্যবাদীদের সমাজবিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াপন্থাকে নির্মম বাক্যবাণে জর্জরিত করেন, তেমনি সমাজ-রাজনীতি ব্যাখ্যায়ও ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধারণাকে ইতিহাসের আলোকে অসার প্রতিপন্ন করেন। আবু জাফর শামসুদ্দীনের পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থের[১] ওপর

সীমাবদ্ধ; বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনা— সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্মব্যাখ্যা—তিন পর্বে বিভক্ত[২]; তবে সর্বত্রই তাঁর সঙ্কীর্ণতাঊর্ধ্ব স্বাজাত্যবোধ, অপার মানবিকতা, গণতন্ত্রচেতনা, এবং সর্বোপরি সমাজসংলগ্নতা অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

সাহিত্য

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোনো স্বতন্ত্র আলোচনা পরিদৃষ্ট নয়; সাহিত্য বিশ্লেষণেই তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে। 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থ-শিরোনামাযুক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য বিবেচনার ক্ষেত্রে লেখকের স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি এ-প্রবন্ধে অস্পষ্ট নয়। নাতিদীর্ঘ ভূমিকাংশেই তিনি বিশ্লেষণ-নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, কলাগুণ তাঁর বিচার্য নয়, বিবেচ্য সমাজমনস্কতা :

> গ্রন্থকার সমাজ-সচেতনতার মাপকাঠিতেই আলোচিত লেখকদের লেখা বিচার করেছেন। রচনার শৈল্পিক মান কিংবা সাহিত্য ক্ষেত্রে কারো স্থান নির্ধারণ গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য নয়।[৩]

সাহিত্য বিচারের এ-মানদণ্ড নির্ধারণের মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে লেখকের সমাজসংলগ্ন লোককল্যাণমুখী শিল্পচেতনা। তাঁর গভীর বিশ্বাস :

> সাধারণ মানুষের মতো শিল্পীও সামাজিক জীব। তবে সাধারণ মানুষ এবং শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানুষ স্থিতাবস্থার বাইরে কল্পনা করে না...
>
> শিল্পী স্রষ্টা—কিন্তু স্থিতাবস্থা বহাল রাখার স্রষ্টা নয়, কেননা তেমন স্রষ্টা আসলে স্রষ্টা নয়, অনুকারীমাত্র। খাঁটি শিল্পী নতুন শিল্পের প্রবর্তক।...
>
> ...শিল্পীমাত্রেই স্থিতাবস্থার শৃংখলা এবং শৃংখল থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়।[৪]

শিল্পবোধ-সম্পর্কিত এ-মনোভঙ্গি থেকেই কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি শিল্পবিপ্লবোত্তর কালের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী সমাজবিরুদ্ধ নৈরাজ্যবাদী ধারণা খণ্ডন করেন। "কবিতা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণই সমাজ-সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিক প্রচেষ্টা"--এমন আত্মবাদী চেতনার বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন যে, প্রথমত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ কেবল সামাজিক ব্যবহারের মধ্যেই বিদ্যমান এবং সামাজিক উন্নতির সাথে পরিবর্তনীয়, অতএব কবির অনন্যনির্ভর দাবি পরিত্যাজ্য; দ্বিতীয়ত স্বীয় একান্ত মনোভাবকে ব্যক্ত করতে গিয়ে রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প প্রভৃতির মাধ্যমে কবি সামাজিক মনকেই প্রতিফলিত করেন। এক্ষেত্রে তার সংশ্লেষণ নিম্নরূপ :

> কবিতা একই সঙ্গে বিষয়গত এবং ভাবগত। অর্থাৎ বিষয় এবং ভাবের সংমিশ্রণেই তার সৃষ্টি।[৫]

তাঁর এ-পর্বের পটভূমিমূলক আলোচনা কেবল কবিতার সমাজসংশ্লিষ্টতা অন্বেষণেই সীমাবদ্ধ নয়, কবিতার আধুনিকতা অনাধুনিকতা, সার্থকতা অসার্থকতা নির্ণয়েও অগ্রসরমান। "ছন্দায়িত হলেও শুধু বর্ণনামূলক রচনা সার্থক কবিতা নয়"—এ প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি আধুনিক গদ্য কবিতা সম্পর্কিত অজ্ঞতাজনিত বিভ্রান্তি বিমোচনের প্রয়াসে বলেন :

> বলিষ্ঠ, সবল এবং তাৎপর্যপূর্ণ রূপক, উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প ইত্যাদি সৃষ্টি এবং উপমা উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করতে পারলে অমিল রচনাও সমিল রচনার চাইতে অনেক বেশী সার্থক কবিতা হয়ে উঠে।[৬]

কবি ফররুখ আহমদের কবিতা মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাবন্ধিক তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'কে "সামগ্রিক বিচারে একটি উত্তম শিল্পকর্ম" হিসেবে অভিহিত করেন। প্রবন্ধকারের মতে, আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদকে এ-কাব্যে অপরাজেয় উচ্ছল জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহারের মাধ্যমে তরুণ সমাজের সামনে নতুন সমাজ বিনির্মাণের আমন্ত্রণ জানিয়ে কবি একটি সুস্থ-সবল, প্রবল আশাবাদী ও মুক্ত জীবনের জয়গান গেয়েছেন। পরবর্তী কাব্য ও কাব্য-নাটকে কবির প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যে-পরিবর্তন ঘটেছে তা প্রবন্ধকারের দৃষ্টি এড়ায় না, এবং

একটি তীর্যক মন্তব্যে তিনি যথার্থই ফররুখ আহমদের ধর্মচিন্তা ও মানবতা-বোধের সার্থক সমন্বয়কে আবিষ্কার করেন। তবে টলস্টয়ী মানবতাবোধের সঙ্গে ফররুখ আহমদের মানবতাবোধের সাযুজ্য সন্ধানের বিষয়টি তর্কমুক্ত নয়।

প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে, সামগ্রিক বিচারে সৈয়দ আলী আহসান বিশেষ কোনো ঘোষিত আদর্শভুক্ত নন। অধিকাংশ কবিতাই তার "অন্তর্দর্শনমূলক" কিংবা "বর্ণনামূলক", "প্রত্যক্ষভাবে প্রচারমূলক" লেখা তাঁর নেই। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার কবিমনেও এসেছে প্রশান্তির মাধুর্য। কিংবা, তাঁর প্রথম কাব্য 'চাহার দরবেশ' "নবোন্মেষিত রোমান্টিক মনের সৃষ্টি"—এ-জাতীয় বিশ্লেষণের পরেও যখন প্রাবন্ধিককে তার 'পূর্ববঙ্গ' কবিতায় মৃত্তিকাসংলগ্নতা ও স্বাজাত্যবোধের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করে এর আবেদনকে "বিশ্ব মানবিক" বলে অভিহিত করতে নিষ্কুণ্ঠ দেখি, তখন বিচারের পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না।

কবি ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসানের কবিবৈশিষ্ট্যে কাজী নজরুল ইসলাম ও ইকবালের মহিমা আবিষ্কারের পর রোমান্সধর্মী গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত আহসান হাবীবের কবিতার পরিচ্ছন্ন ও ঋজু বৈশিষ্ট্যে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে-র প্রভাব লক্ষ্য করেন। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় আহসান হাবীবকে "সমাজসচেতন জীবনধর্মী" কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেও তিনি একটি 'হয়ত' বিশেষণ প্রযুক্ত করেন এ-কারণে-যে,

> আশা নিরাশার সংশয় দোলায় তার চিত্ত সতত দোলায়মান বলে মনে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির অন্তর্নিহিত বিরোধও তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে।[৭]

কবি আহসান হাবীবের ওপর কোনো ইউরোপীয় কবির প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। সহজ স্বচ্ছন্দতা, ঋজুতা এবং পরিপাটি নির্মাণকৌশল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রতি তীব্র ভালোবাসা, অনাচারের প্রতি বিদ্রোহ, সামাজিক বৈষম্যকে তীব্র শ্লেষের কশাঘাতে সংশোধনের স্পৃহা প্রভৃতিও মাঝে মাঝে আহসান হাবীবের কবিতায় শুকতারার ঔজ্জ্বল্য লাভ করে।

এ-তিনজন ব্যতীত উত্তর-তিরিশে আবির্ভূত সিকান্দার আবু জাফরের শিল্পীজীবনের শুরুই সমাজসচেতন লেখক হিসেবে। মাঝে মাঝে কবিসুলভ

স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হলেও সিকান্‌দার আবু জাফর যে মূলত আশাবাদী সরব জীবনের কবি সে ব্যাপারে প্রাবন্ধিক নিঃসন্দিগ্ধ। "জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর অনুসারী শামসুর রাহমানের মতো মৃত্যুর স্তব্ধতা সিকান্‌দার আবু জাফরের কাম্য নয় এবং ক্লান্তির ম্লান ছায়াও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত।"৮ তবু এ জীবনধর্মিতার মধ্যেও কিছু কিছু সংশয়বাদের অনুপ্রবেশ প্রবন্ধকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা রূপকাশ্রয়ী হলেও সংশয়উর্ধ্ব, অসপিল, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন-কামী। প্রথম নাটকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের সুপারিশ ও দ্বিতীয়টিতে শান্তির মহিমা ও শ্রেষ্টত্ব প্রচারের মাধ্যমে তাঁর সদর্থক জীবন-মুখী মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট।

ইকবাল-নজরুল কর্তৃক নয়, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত স্বল্পপ্রজ আবুল হোসেনের মধ্যে একটি অবিচলিত নিষ্ঠা প্রাবন্ধিক প্রত্যক্ষ করেন। "বৈষম্য বিক্ষুব্ধ জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা তার চিত্তে প্রথম জীবনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল" তার প্রতি তিনি অব্যাহতভাবে আন্তরিক থেকেছেন। এ আন্তরিকতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এক-জাতীয় লঘুলয়ী সূক্ষ্ম শ্লেষ বিদ্রূপ।

রবীন্দ্রপ্রভাব ও রোমান্সপ্রবণতার মধ্যেও সানাউল হকের কবিতায় মাঝে মাঝে সমাজসচেতনতার তীব্রতা অতিমাত্রায় লক্ষ্যযোগ্য। উপমা, চিত্রকল্প ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় ইংরেজ কবি হপকিন্‌সের প্রভাব ও ভাবগত পার্থক্য প্রত্যক্ষ করে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুজন এক পথের পথিক নন :

> সানাউল হক আধুনিক কালের মানুষ : কাব্যের সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক তাঁর কাছে সম্ভবত: অবান্তর।৯

"সমাজবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক, ভাববাদী" হওয়া সত্ত্বেও বিভাগোত্তরকালের কবি হিসেবে একমাত্র শামসুর রাহমান এ-প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার কারণ, অন্যদের তুলনায় তিনি "অধিক পরিচিত"। নিঃসন্দেহে অধিকতর পরিচিতির গৌরব তিনি আজও ধারণ করে আছেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর সমাজবিরুদ্ধ আত্মমুখী কবিভাবনাকে তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন। সমালোচক হিসেবে তিনি এক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্মম, এবং তাঁর ভাষা লক্ষ্যভেদী। বিস্তৃত পরিসরে

হলেও শামসুর রাহমানের কবিতার গুণাগুণ বিচারে তিনি অক্লান্ত। শামসুর রাহমানের কবিস্বভাবের স্বরূপ উন্মোচনকল্পে সমালোচক হিসেবে আবু জাফর শামসুদ্দীন যে অপরিসীম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিম্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে অনুভব করা যাবে—

> "নিপুণ গোয়েন্দার মতো" তাঁর কবিতায় "হন্তদন্ত হয়ে" "গ্রীক পুরাণের উল্লেখ" খুঁজলে অথবা "দেশী কিংবা বিদেশী কবির প্রভাব শুঁকে" বেরালে শামসুর রাহমান গোস্বা হন। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির কোন প্রয়োজন নেই, কেননা বিষ্ণু দে এবং সুধীন দত্তের প্রায় বিশ্বকোষী তথ্যজ্ঞানের অভাবে তাঁর কবিতায় গ্রীক পুরাণের চরিত্র বিরল এবং জীবনানন্দ দাশ তাঁর ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ এবং শব্দাবলী যেমন হরিণ, খরগোশ, করোটি, বাঘ, নেকড়ে, ঘাস ইত্যাদি সহ, কিন্তু গভীরতাটুকু বাদে, এত প্রকট যে, তা উপলব্ধি করার জন্যে কোনরূপ বাহুল্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জীবনানন্দ দাশের হরিণ ঘাস খায়, আর শামসুর রাহমান নিজেই হরিণের মতো দাঁতে ঘাস ছিঁড়েন।...
>
> তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঠাস বুনানি ভিত্তিক নির্মাণ কৌশলে শামসুর রাহমান নিপুণ কারিগরসুলভ শৈল্পিক দক্ষতা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। কিন্তু নতুন বোতলে পুরাতন মদ ঢালার কার্যে তাঁর ব্যবসায়বুদ্ধি এত কম যে, পানশালার নিয়মিত গ্রাহক ত দূরের কথা, কালেভদ্রের আগন্তুকেরও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এবং একথাও খাঁটি যে, অপরের ভাষা ও ভাব অনুসরণজাত শৈল্পিক নৈপুণ্য যত বড়ই হোক, তদ্দ্বারা সাহিত্যে স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেননা ইয়েটস্, জীবনানন্দ দাশ এবং বোদলেয়র যাদের কাছে সহজলভ্য তাদের কাছে শামসুর রাহমান অনাকর্ষণীয়ই থেকে যাবেন।[১০]

কবিতার আলোচনাশেষে প্রাবন্ধিক প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের মূল্যায়নের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। প্রথমেই, বন্ধুমহলে "সমাজসচেতন বিদগ্ধ শিল্পীরূপে সমাদৃত" শওকত ওসমানের ওপর বিশ্লেষণ কেবল "ক্রীতদাসের হাসি" উপন্যাসে সীমাবদ্ধ রেখে, প্রাবন্ধিক, উপসংহারে পৌঁছান যে এ-উপন্যাস রচনার সমকালে শওকত ওসমান নঞর্থক

জীবনভাবনায় উদ্দীপ্ত। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে তিনি শুধু "গান্ধীর অহিংস অসহযোগ এবং বৈরাগ্যবাদী দর্শনের পরিপোষক ও মধ্যযুগীয় রোমান্সপ্রবণতা" প্রত্যক্ষ করেন। উপন্যাসটিতে "কোনো সদর্থক ক্রিয়া" কিংবা "নতুন দর্শন" কিংবা রূপক কাহিনী হিসেবে "সবল জীবনবাদের" লক্ষণও তাঁর দৃষ্টিভূত হয় না। যে রাষ্ট্রীয়—রাজনৈতিক সন্ত্রাসকালে শওকত ওসমানের এ রূপক—উপন্যাসটি রচিত, তার আর্থ—সামাজিক পটভূমির আলোকে বিবেচনা করলে রূপক হিসেবে এর তাৎপর্য অনুসন্ধান কঠিন নয়। কিন্তু সে-ধরনের ব্যাখ্যায় প্রাবন্ধিক অগ্রসর না হওয়ায় তাঁর কাছে শওকত ওসমানের পরিবর্তনের কারণও দুর্বোধ্য থেকে যায়।

তবে শামসুর রাহমানের মতো আলাউদ্দীন আল-আজাদ সম্পর্কিত তাঁর বিশ্লেষণও দূরস্পর্শী। কলাগুণ বিচারে ত্রুটিপূর্ণ হলেও 'জেগে আছি' ও 'ধান কন্যা'র গল্পগুলোতে আলাউদ্দীন আল আজাদের যে সামাজিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত, পরবর্তী 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ও 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসদ্বয়ে তা একান্তভাবে ব্যক্তিসমস্যাকেন্দ্রিক বিকৃত যৌনভাবনায় পর্যবসিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাধিত লেখকের মনোগত পরিবর্তনকে প্রাবন্ধিক যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেন।

জনজীবনসংলগ্নতাকে অঙ্গীকার করে পরিপুষ্ট হলেও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের গল্পের প্রচারধর্মী বিশেষত্ব প্রাবন্ধিক কর্তৃক নির্মম সমালোচনার শিকার হয়, কিন্তু তিনি স্বীকারে কুণ্ঠিত হন না যে "সম্ভবতঃ সার্থক সমাজসচেতন গল্পের সংখ্যা আলোচিত আর সকলের চাইতে আবুল কালাম শামসুদ্দীনেরই বেশী।"[১১]

আবু জাফর শামসুদ্দীন তিরানব্বই পৃষ্ঠার এ দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সকল কবি সাহিত্যিকের রচনা বিশ্লেষণে মনোযোগী না হলেও বিভাগোত্তরকালের বাংলাদেশের সাহিত্যের গতি—প্রকৃতি ও মৌল প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেদিক থেকে প্রবন্ধের আলোচনা সামগ্রিকতাস্পর্শী। আইয়ুবী শাসনের স্বৈরাচারী পরিমণ্ডলেও তিনি সাহিত্য মূল্যায়নে যে সমাজ মনস্কতা, পক্ষপাতশূন্যতা ও শিল্পগত আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর মহৎ জীবনাগ্রহ ও নির্লোভ সাহসী ব্যক্তিত্বকেই চিহ্নিত করে।

সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রভাবসূত্র অনুসন্ধান অনেকক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু তুলনামূলক বিবেচনার গুরুত্ব সর্বদাই তাৎপর্যবহ। এ-প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনে ব্যাপৃত হয়ে প্রয়াশঃ ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিস্তৃতভাবে কবিতা ও বাংলাদেশের সাহিত্যের পটভূমি আলোচনায়ই কেবল তিনি প্রতীচ্যের দ্বারস্থ হননি, কবি-সাহিত্যিকদের স্বতন্ত্র মূল্যায়নেও পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পীদের সর্বব্যাপী প্রভাবের পরিচয় উন্মোচন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতার পাশাপাশি বিদেশী সাহিত্যিকদের প্রভাব আবিষ্কারে সচেতনতা ও অনায়াস অনুসন্ধানে সার্থকতাও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তবে আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাহিত্যবিবেচনা যে সর্বাংশে যথার্থ হয়েছে, তেমন দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন, একমাত্র সমাজমনস্কতা কিংবা বস্তু-নিষ্ঠ সামাজিক উপাদাননির্ভরতাকেই মার্কসীয় ভাবাদর্শ-উদ্বুদ্ধ সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি বিবেচনা করলে পদস্খলনের যে আশংকা থাকে তা আবু জাফর শামসুদ্দীনের বিশ্লেষণেও লক্ষ্য করি। সামাজিক অনুষঙ্গ-মুক্ত একটি নিখুঁত সৌন্দর্য সৃষ্টিও যে উন্নত মহৎ শিল্পের মর্যাদা লাভে সক্ষম—কেননা সত্যই সুন্দর, এবং তা জীবনবিরোধী নয়—এক কালের কট্টর মার্কসপন্থীরা তা স্বীকার করতেন না। সরল মার্কসীয় বিচারপদ্ধতির অনুসারী হওয়ায় আবু জাফর শামসুদ্দীনের কতক উচচারণও তাই হয়ে উঠেছে বিতর্কসাপেক্ষ। যেমন,

> ...শরৎ সাহিত্যও সামন্ততান্ত্রিক মধ্যবিত্ত সমাজবৃত্তে তার মীমাংসাতীত সমস্যাবলী নিয়ে রচিত এবং বিশেষ একটি আস্থাভিত্তিক ব'লে স্থানকালের বিচারে মূল্যহীন এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে গণ্য।...সাম-গ্রিক বিচারে তারাশঙ্করও শরৎচন্দ্রের দুর্বল অনুসারী এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার সমর্থক।[১২]

কিংবা—

> সমাজ-সচেতন সাহিত্য বলতে একালে আমরা যা বুঝি, নজরুল ইসলামের কাব্যেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ...কিন্তু সামগ্রিক রচনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সংজ্ঞায় সমাজ-সচেতন শিল্পী নন।[১৩]

২.

'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে যেমন কবিতার আলোচনা অধিকতর স্থান জুড়ে ব্যাপ্ত, তেমনি আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে তুলনামূলকভাবে কবিতা-বিচারের পরিধিই বিস্তৃত। তবে কবিতা-বিষয়ক তত্ত্বালোচনা উক্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যে-পরিমাণে বিদ্যমান, তদতিরিক্ত এ-সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোনো বিশ্লেষণ অন্যত্র অনুপস্থিত। একটি প্রবন্ধে 'কবিতার ভাষা' ('সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) সম্বন্ধে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও নতুনত্বহীন পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয়। সময় ও কালের আবর্তনের সঙ্গে কবিতার ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প ব্যবহারের পরিবর্তন অনিবার্য—এ-প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কর্তৃক উন্মোচিত এ-সত্য কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই নয়; শিল্প-সংস্কৃতির সকল শাখার জন্যই প্রযোজ্য।

কবিতা-বিষয়ক আলোচনায়, সমাজমুখিতার কারণে, কাজী নজরুল ইসলামেরই প্রাধান্য। নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রবন্ধই 'সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এর তিনটি প্রবন্ধই মূলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা উন্মোচনে নিবিষ্ট। 'নজরুল সাহিত্যে' শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁর কবিপ্রতিভার যথার্থ বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের দাবি পরিব্যক্ত হয়েছে। নজরুল ইসলামকে খণ্ডিতভাবে বিশ্লেষণের যে কূপমণ্ডূক পশ্চাৎমুখী প্রবণতা আমাদের দেশে সরবে অস্তিত্ববান, তার বিরুদ্ধে শিল্পসম্মত প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এ-প্রবন্ধে। তাঁর বিদ্রোহী-বৈশিষ্ট্যের ত্রিমাত্রিক রূপ এখানে উন্মোচিত। প্রথমত ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণজনিত মর্যাদাহীনা বৈষম্য ও অজ্ঞানতা-জনিত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়ত পরিশ্রমজীবী লোকসমাজের প্রতি-বঞ্চনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে, এবং তৃতীয়ত সর্বমুখী সাম্প্রদায়িক মানসতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। "কালজয়ী প্রতিভামাত্রেই বিদ্রোহী"—এ-উচ্চারণের মাধ্যমে লেখক নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী সত্তাকে মহিমাদীপ্ত করেছেন। সাহিত্য-মূল্যায়নে সামগ্রিকতা অর্জনের মার্কসীয় রীতির অনুসারী হয়েই তিনি উচ্চারণ করেন: "কোন মহৎ কাব্য-প্রতিভাকে ব্যবচ্ছেদ করে বিচার করা যায় না।"[১৪] মূলত বিশ্বমানবের সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ঐশ্বর্যবান করে তিনি সমগ্র মানবসমাজের কবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

'নজরুল সাহিত্যে বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর বিদ্রোহী-সত্তার অন্তর্সত্য নির্ণয়ের জন্য বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে, বিশেষত পূর্ববর্তী মাইকেল মধুসূদন দত্তের শৈল্পিক বিদ্রোহের প্রতি, প্রাবন্ধিক তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে কেবল সমাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ-বিদ্রোহের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে নজরুলের বিদ্রোহ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধেও উচ্চকিত হওয়ায় তা সামগ্রিকতা অর্জন করেছে। এ-বিদ্রোহ কেবল ধ্বংসাত্মক নয়, নির্মাণাত্মক, এবং নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এ-প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনায় দ্বিতীয়োক্তের অবদানের অবমূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্তব্যটি বিতর্কসাপেক্ষ।

যথার্থই, বাঙালি মুসলমানের পশ্চাদ্‌গতিশীল সম্প্রদায়সাপেক্ষ মানসতার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পুনর্জাগরণমূলক তরঙ্গাঘাত হানেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি মুসলিম সমাজের অন্তর্জগতে নানামুখী বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার যে শতাব্দী-প্রাচীন অন্ধকার লালিত ছিল, সেখানে তিনিই প্রথম আলোর প্লাবন সৃষ্টি করেন। 'সাংস্কৃতিক রূপান্তরে নজরুলের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধের এ মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে লেখকের স্পষ্ট উচ্চারণ :

> আমাদের স্বাধীনতাবোধ, আমাদের মর্যাদাবোধ, আমাদের মুক্তচিন্তাবোধ প্রভৃতি যুগোপযোগী বোধের মূলে আছেন কাজী নজরুল ইসলাম।[১৫]

'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' শীর্ষক আলী আশরাফ-সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে রচিত হয়েছে 'নজরুল কাব্যের উৎস ও কাব্য বিচার'। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত নজরুল ইসলামের পত্রগুলো পরবর্তীকালে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ভেবে, সচেতনভাবে রচিত না হলেও, তার শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য। এ-প্রবন্ধে লেখক সাহিত্য-সমালোচনার টি. এস. এলিয়টীয় পদ্ধতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কাব্যোৎপত্তির হেতুর চেয়ে কাব্য কাব্যিক গুণাবলীতে সম্পূর্ণতা অর্জন করে পাঠকমনে আবেদনবাহী হল কিনা—সেটাই কাব্যমূল্যায়নের মূল বিবেচ্য। তবে স্মর্তব্য যে, বিশ্লেষণের এরূপ মাপকাঠি সব সময় মার্কসীয় বিচারপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

'কাব্যে প্রত্যক্ষ আবেদন : নজরুল ও হুইটম্যান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক হুইটম্যানের কবিতার প্রত্যক্ষ আবেদনমূলক মৌল প্রবণতার সঙ্গে নজরুল ইসলামের কবিবৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেছেন। শিল্পবিপ্লবোত্তর প্রতীচ্য সাহিত্যে বাস্তবধর্মী ও প্রত্যক্ষ আবেদনবাহী কবিতার যে নবতর ধারার সূচনা করেন মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান, বাংলা সাহিত্যে তারই প্রথম সার্থক প্রতিনিধি কাজী নজরুল ইসলাম। এ-প্রবন্ধে সমান্তরালভাবে উভয়ের কবিতার উদাহরণ স্থাপন করে সাযুজ্যকে স্পষ্টতর করা হয়েছে।

'হুইটম্যানের কবিতা'[১৬] শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রচলিত পরোক্ষ কাব্যিক রীতির পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রত্যক্ষ আবেদনধর্মী কবিতা রচনার হুইটম্যানীয় বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত 'হুইটম্যানের কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনা। এতে সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদের মৌলিকত্বকেও যথার্থভাবে বিচার করা হয়েছে।

'অপরাজেয় কবি ফররুখ আহমদ' ('সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক নিবন্ধটি তাঁর জীবনাবসান সম্পর্কিত মানসিক প্রতিক্রিয়া। এতে কবি-বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের পরিবর্তে ব্যক্তি ফখরুখ আহমদের বিশ্ব মানবতাবাদী চেতনা, দারিদ্র্যের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব-সতর্কতা এবং স্বীয় উপলব্ধি ও বিশ্বাসের প্রতি আমৃত্যু প্রতিশ্রুতিশীল ও দৃঢ়প্রত্যয়ী মনোভাব তথ্যাকারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

'কবিয়াল রমেশ শীল' শীর্ষক প্রবন্ধে রমেশ শীলের কবিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়সূত্রে তাঁর কবিতায় লোকবৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যে নাগরিক জীবনোপকরণ এবং সর্বোপরি সামাজিক অঙ্গীকার প্রত্যক্ষ করা যায়, তার শ্রেণী-বিচার করে বাংলা কবিতার ধারায় রমেশ শীলের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রবন্ধে কথাসাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা কবিতার তুলনায় অধিক বিশ্লেষণসিদ্ধ, অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ও সূক্ষ্মতর মননসমৃদ্ধ। এর স্পষ্ট কারণ, কথাসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উন্নততর উপলব্ধির জগতে উপনীত হয়েছেন তিনি।

তবে তাঁর 'কথাসাহিত্য'[১৭] শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সুগভীর মূল্যায়নের পরিচয় পরিস্ফুট নয়। একটি সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণ হিসেবে রচিত এ-প্রবন্ধটি অনেকটা স্কেচধর্মী। এ-প্রবন্ধে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে তুলির টানে তিনি অনেক মন্তব্যের রেখা-চিহ্নই শুধু এঁকে যান, কিন্তু তা পাঠকচৈতন্যের মর্মমূল স্পর্শ করে না। উপরন্তু এমন কিছু সরলাত্মক ও কখনও কখনও বালখিল্য মন্তব্য প্রয়োগ করেন, যা প্রবন্ধটির মান ক্ষুণ্ন করে। যেমন,

> রোমাণ্টিক যুগের মূলমন্ত্র ছিল আর্ট ফর আর্টস সেক—শিল্পের জন্যই শিল্প। এখন তা নেই। যে লেখার সঙ্গে সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নেই, যে লেখায় সমাজের বহুমুখী সমস্যার বিশ্লেষণ, বিবরণ ও সমাধানের ইঙ্গিত নেই, আধুনিক জগতে তা সাহিত্য নয়। আজকের সাহিত্যিককে সমাজ সচেতন হতেই হবে।[১৮]

এটি একান্তই সরলধর্মী মার্কসীয় ব্যাখ্যার নামে অমার্কসীয় উপলব্ধি। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণের মার্কসীয় রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকন্তু তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের তুলনা করে উচ্চারণ করেন যে,— "সেদিন খুব দূরে নয়—যেদিন আমাদের কথাসাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যকে ছাড়িয়ে যাবে"[১৯], তখন তাঁর মধ্যে এক ধরনের প্রচারধর্মী বালকসুলভ অপকর্ষবোধই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সমগ্র শিল্পবোধ ও সমাজ-ভাবনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন।

'উপন্যাসের উপকরণ' ('সোচ্চার উচ্চারণ'-এর অন্তর্গত) প্রবন্ধে আবু জাফর শামসুদ্দীন যথার্থই জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করে পরিপুষ্ট যে উপন্যাস তার সার্থক উপকরণ হিসেবে একটি জাতির জীবনসম্ভাবনার মৌল উপাদানসমূহের অন্বেষণকে অনিবার্য বিবেচনা করেন। সে কারণেই তিনি প্রতিটি জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক আবর্তনের অনুষঙ্গ হিসেবে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপরিহার্যতাকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কেও সতর্ক। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিচারবোধ সহজতায় আচ্ছন্ন নয় বলেই বাংলা উপন্যাসের উপকরণ বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে "বাংলাদেশের সবচাইতে সাবধানী, কর্তব্য সচেতন এবং শক্তিশালী লেখক"[২০] হিসেবে আখ্যায়িত করতে সমর্থ হন, এবং দার্শনিক মতবাদ যাই থাক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র

উপন্যাসসমূহ যে "বাংলার মাটির রসে স্নিগ্ধ",[২১] তা উচ্চারণেও দ্বিধান্বিত হন না। তাঁর উপন্যাস-সম্পর্কিত বিশ্লেষণবোধের গভীরতা, বিস্তৃতি ও জীবন-সংলগ্নতা এ-প্রবন্ধে অনুভব করা যায়।

শুধুমাত্র পরিবেশগত বাস্তবতা পরিস্ফুটনের জন্য নয়, প্রকৃতি যে চরিত্রের মনোজগতের বৈচিত্র্য ও গতিময়তার অনুষঙ্গ হিসেবেও সাহিত্যে বিন্যস্ত হয়—সে-সত্য প্রবন্ধকারের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত। ফলে 'সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাব' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়টি তাঁর কাছে কেবল মানুষ প্রকৃতিলালিত এ-পরিচয়েই উন্মোচিত হয়। এ-প্রবন্ধে মানব ও নিসর্গের বহির্গত সম্পর্ক আবিষ্কারেই প্রাবন্ধিকের প্রয়াস নিঃশেষিত। প্রকৃতি তার নানামুখী বৈচিত্র্য ও বৈভব নিয়ে প্রতিনিয়ত মানবমনে যে সূক্ষ্ম আবেদন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার অন্তর্সত্য উন্মোচনে তিনি সক্ষম হননি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সচেতন। কিন্তু তাঁর 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটির দীর্ঘ মূল্যায়নে উপন্যাসটিকে 'ব্যতিক্রমধর্মী' আখ্যাদান এবং এর বিষয়বস্তু ও মূল সুরের নতুনত্বকে চিহ্নিত করা ছাড়া আর কোনো সার্থকতা পরিদৃষ্ট হয় না। 'একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস'[২২] শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত উপন্যাসের পর্যালোচনায় উচ্চমানসম্পন্ন সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ-প্রাজ্ঞতা অনুপস্থিত। আলবেয়ার ক্যামুর 'প্লেগ', 'দি ফল', দস্তয়েভস্কির 'দি পসেস্‌ড' প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে 'কাঁদো নদী কাঁদো'র তুলনামূলক বিশ্লেষণও কোনো গভীরতর সত্য উন্মোচনে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু 'প্লেগ'-এর সঙ্গে তুলনা করে এ-উপন্যাসে তিনি যে নৈরাশ্যমগ্নতা তথা জীবনের নেতিবাচকতা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা বিতর্ক-উর্ধ্ব নয়। 'কুমুরডাঙ্গা', প্রবন্ধে সর্বত্র 'কুমোরডাঙ্গা' হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। এটি মুদ্রণ-ত্রুটি নয়। তবে প্রবন্ধকার উপন্যাসটির উচ্চ কলাগুণকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে ততটা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে না পারলেও উপলব্ধি করতে যে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়।

> পুস্তকটি পূর্ব-বঙ্গের উপন্যাস সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম এবং বুদ্ধি-বাদ ভারাক্রান্ত উপন্যাস রচনার কার্যে সম্ভবতঃ প্রথম পদক্ষেপ। গ্রন্থকারের ভাষা নির্দিষ্ট ক্ষণের ব্যবধানে পড়ন্ত মন্থর বৃষ্টি-বিন্দুর ন্যায় অনুচ্চ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় গতিশীল। স্থানে স্থানে শব্দ ব্যবহার

> অথবা নতুন শব্দ নির্মাণে প্রশংসাপেক্ষ, অভিনবত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও ভাষার মাধুর্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ।[২৩]

'ম্যাক্সিম গোর্কী'[২৪] শীর্ষক প্রবন্ধটি গোর্কি-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়, তাঁর শিল্পবৈশিষ্ট্যের শ্রেণীবিচার মাত্র। আবু জাফর শামসুদ্দীনের বিচারে বিশ্বসাহিত্যের মূল দুটি ধারা : একটি, ব্যক্তির মন, দেহ ও কর্মের মুক্তি-সন্ধানী, এবং অপরটি, সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে মানুষের সম্মিলিত মুক্তিতে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় ধারার অনুসারী হয়েও "গোর্কী-সাহিত্যে রোমান্স-ধর্মিতা, বাস্তবতা ও মুক্তিবোধ"[২৫] অনুপস্থিত নয়। গোর্কি-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ সর্বাংশে সমাজসংলগ্ন :

> পৃথিবীর মানুষের তিন-চতুর্থাংশ আজও নিপীড়িত, বঞ্চিত : তারা জীবন রক্ষার জন্য সততঃ কর্মের সন্ধান করছে তবু সর্ব-নিম্ন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। ওদের মনোবীক্ষণ করতে হয় না; কেননা ওদের জীবন প্রেতের অন্ধকার জীবন নয়, ওদের জীবন পূর্ণ প্রকাশিত জীবন। গোর্কী এই পূর্ণ প্রকাশিত জীবন থেকেই তাঁর শিল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন।[২৬]

ফরাসী লেখক 'আদ্রেঁ মরোয়াঁ' ('সোচ্চার উচ্চারণ'-এর অন্তর্গত) সম্পর্কিত আলোচনাটি পরিচিতিমূলক। অসামান্য মৌলিক প্রতিভার অধিকারী না হয়েও একজন লেখক কিভাবে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হন, তারই বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে এ নিবন্ধে।

ছোটগল্প-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধের একটির শিরোনাম 'ছোটগল্পে মৌলিকতা বনাম শালীনতা' ('চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেও এ-প্রবন্ধে আবু জাফর শামসুদ্দীন একটি মৌলিক প্রশ্ন মীমাংসায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর মতে, "শালীনতা বস্তুটি আসলে একটি সামাজিক মূল্যবোধ, পক্ষান্তরে মৌলিকতা সম্পূর্ণ ব্যৈক্তিক।"[২৭] কিন্তু ব্যক্তিক হলেও নগ্নতাকে মৌলিক বলতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ যে সকল কর্ম জনসমক্ষে সংসাধিত হয় না তার বর্ণনা, তাঁর মতে, শালীনতাবর্জিত। বিষয়বস্তুগত নয়, লেখকের মৌলিকতার বিষয়টি প্রকাশ-ভঙ্গিগত : "যে লেখক যত সংযমী তিনি তত মৌলিক।"[২৮]

'ছোটগল্পে ঐতিহ্য'[২৯] শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক আলোচনার বিস্তৃত ক্যানভাস ব্যবহার করলেও তার অভ্যন্তরীণ তুলির টান ও রং ব্যবহারের সৌকর্য গভীরভাবে হৃদয়স্পর্শী নয়। ঐতিহ্যের সাধারণ আলোচনাসূত্রে, তিনি যথার্থই বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্যসমূহের অংশীদার হিসেবে আমাদের ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করেন এবং ছোটগল্প সে ঐতিহ্যকে ধারণ করছে বলে উপসংহার টানেন; কিন্তু উভয় সিদ্ধান্তই অভ্যন্তরীণ বক্তব্য বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দ্বারা সমর্থিত নয়।

৪.

'নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত'[২৯] শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মননশীলতার পাশাপাশি গবেষণাধর্মিতা যুক্ত হয়ে এবং বিষয়-নির্বাচনে একান্তভাবে একটি সাহিত্য-সমস্যা স্থানলাভ করে প্রবন্ধটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধে যখন মননশীলতাই প্রধান উপাদান এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে যখন বিশুদ্ধ সাহিত্য-বিবেচনার পরিবর্তে সমাজ-সংলগ্নতাই অধিক গুরুত্ব পায়, তখন এ-প্রবন্ধে কেবল একটি সাহিত্য-মীমাংসার জন্য সুদীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়ার বিষয়টি বিস্ময়কর। প্রবন্ধের প্রারম্ভে নাটকটি রচনার পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণের পর আবু জাফর শামসুদ্দীন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য অনুযায়ী, নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদের কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও সুপ্রিম কোর্টের চাকরি ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন স্বীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এ সংক্রান্ত বহু তথ্য, অভিমত ও যুক্তি উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট মানের গবেষণা হিসেবে দৃষ্টান্তস্থানীয়।

৫.

বিষয়বস্তু যদিও সাহিত্য নয়, কিন্তু সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব;—সে কারণেই এ-পর্বের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংক্রান্ত দুটি প্রবন্ধ। এর একটি, তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, এবং অন্যটি, মৃত্যুর এক বছর পরের মূল্যায়ন। 'মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধটি রচনাকালে তিনি সম্প্রতি-লোকান্তরিত,

ফলে প্রবন্ধটিতে মূল্যায়নের পরিবর্তে তাঁর সম্পর্কিত আবেগই মুখ্য। এতৎসত্ত্বেও এ-প্রবন্ধে বহু ভাষাবিদ, আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভাবান এ বিদ্বান ব্যক্তির নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর ও গণমুখী জীবনের স্বাজাত্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, জাতিকল্যাণ কামনা প্রভৃতিকে তিনি যথার্থভাবেই উন্মোচন করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিভার সঙ্গে আল-বেরুনী, আমীর খসরু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখর সাযুজ্য সন্ধান করেছেন। প্রবন্ধটিতে একটি শতাব্দীশ্রেষ্ঠ মনীষার মহত্ত্বের বৈচিত্র্যময় মাত্রাসমূহ উন্মোচনের সামাজিক কর্তব্যবোধই অভিব্যক্ত হয়েছে।

মৃত্যুর এক বছর পরে লিখিত 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : একটি অনালোচিত দিক'৩০ শীর্ষক প্রবন্ধে উন্মোচিত হয়েছে এ-মনীষীর সমাজসংলগ্ন জীবনভঙ্গি। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ যুগের অধিবাসী হয়ে, বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠায়, তার বিভিন্ন শাখার উন্নতিসাধন এবং ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের গবেষণায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেও কিভাবে তিনি বাংলার সকল শ্রেণী ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে কেবল পরিচিতই নন, শ্রদ্ধাভাজন ঘনিষ্ঠজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হয়েও মনে-প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, এ-প্রবন্ধে তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে।

৬.

'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রবন্ধ---'সাহিত্য বিচারে মূল্যবোধ', 'লেখকের বৃত্তি' ও 'বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম'—বিচিত্র বিষয়াবলম্বী। প্রথম প্রবন্ধে সাহিত্য বিবেচনায় মূল্যবোধকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। এবং এ-সূত্রে মূল্যবোধের বহুমাত্রিক রূপ—অর্থাৎ তার চিরন্তনতা, আপেক্ষিকতা, পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতিকে—এবং সে-সঙ্গে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ককে গভীরতর মননশীলতা দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে লেখকের বিশ্লেষণীদৃষ্টি বিষয়ের অন্তর্গভীরে প্রবিষ্ট। মানবজীবন, মানব-মনস্তত্ত্ব, তার বিশ্বাস ও চৈতন্য, অনুভূতি ও বোধ প্রভৃতির সূক্ষ্মতর সংবেদনাকে মানবসভ্যতার বৃহত্তর পটভূমিতে উপস্থাপন করে লেখক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

> দেহ ও মনের প্রধান আসক্তিগুলোর সামাজিক পরিণতি যিনি যত বাস্তবানুগ এবং প্রবণতামুখী করে রূপায়িত করতে পেরেছেন তাঁর

> সাহিত্য-কর্ম তত বেশী দীর্ঘজীবী হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[৩১]

'লেখকের বৃত্তি' শীর্ষক রচনাটিতে প্রাবন্ধিক সৃষ্টিশীল লেখকদের পেশার সঙ্গে শিল্পীজীবনের সম্পর্ক আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়ে পেশাকেই প্রতিভা বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে চান না। তিনি বরং উপসংহারে পৌঁছেন যে, লেখার জন্যই লেখা নীতিটি অচল :

> প্রতিভাবান লেখক মাত্রেই আদর্শনিষ্ঠ এবং কোন না কোন আস্থায় আস্থাবান।...শিল্প-সাধনার মাধ্যমে নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসকে প্রচার করাই হলো শক্তিশালী লেখকের মুখ্যকর্ম—পেশা তার জন্য একটি গৌণ ক্রিয়া মাত্র—তবে গৌণ হলেও জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য : কিন্তু যতটুকু অপরিহার্য ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা তার প্রতিভা বিকাশের সহায়ক।[৩২]

'বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম' একটি গবেষণাধর্মী উপযোগিতামূলক প্রবন্ধ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভপর্যায় থেকে তার সকল প্রকরণে পরিদৃশ্যমান দেশপ্রেমমূলক উপাদানসমূহকে এ-প্রবন্ধে উদ্ধৃতি-সহযোগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে স্বাজাত্যবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ লেখকের বড়ো কৃতিত্ব। আন্তর্জাতিকতাবোধের সঙ্গে পরস্পরিত না হলে স্বদেশপ্রেমও যে কখনও কখনও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হতে পারে, তার উদ্ধৃতিসমর্থিত ব্যাখ্যা প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রাজনীতি

আধুনিক যুগে রাজনীতি এমনই একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় যে, কোনো জাগ্রত চৈতন্যই তার ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা অনালোড়িত কিংবা প্রভাবমুক্ত নয়। বিশেষত আবু জাফর শামসুদ্দীনের মতো সমাজসতর্ক প্রতিভা ইতিহাসের এমন একটি বৈচিত্র্যময়, একাধিক ধ্বংস-সৃষ্টির যন্ত্রণাকাতর অধ্যায়ের জীবন্ময় সত্যদ্রষ্টা যে, এ-সম্পর্কে নীরবতা পালন তাঁর জন্য জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। তাঁর রাজনীতিসচেতন মানসলোক গত চার দশকেরও অধিককালব্যাপী এ-দেশের প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিবিদ ও ধর্মজীবীদের দ্বারা রাষ্ট্র, জাতীয়তা, ভাষা, ও সংস্কৃতি বিষয়ে উত্থাপিত নানা বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নে বিদ্ধ এবং তার যথাযথ উত্তর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে। তাঁর

রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এ-সময়কালের ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের যেমন এক গভীরতর বিশ্লেষণ, তেমনি উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তরদানের স্বাক্ষরবাহী।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান নির্মাণ প্রশ্নে বাংলাদেশের সর্বগোত্রীয় জনমানসেও যে উদ্দীপনা ও ভাবালুতা প্রশ্রয় লাভ করেছিল, অন্তরালের শোষক-শক্তির ক্রূর অভিলাষ উপলব্ধির মাধ্যমে তা নির্বাপিত হতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি। বাংলাদেশের এ-অংশকে আধুনিক যুগের সামাজিক শোষণের স্থায়ী লীলাভূমিতে পরিণত করার দূরভিসন্ধি অনুযায়ী ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যখন প্রথম ষড়্‌যন্ত্রের বর্শাফলক নিক্ষিপ্ত হল, তখন শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত তার প্রতিবাদে নিবৃত্ত থাকেনি। এ-ভূখণ্ডের জনমানসের অগ্রসরচৈতন্য একটি উপলব্ধিতে আত্মস্থ হল যে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সৃজনের পথ পাকিস্তানী আদর্শের বিপরীত; আত্মপরিচয়ের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যধারাকে অবিকৃত রাখার বিকল্প নেই। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী স্বাধিকার-সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এ-উপলব্ধিরই বাস্তব ফল। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনাকে এমন প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল যে সে সহস্রাব্দের পশ্চাদ্‌পদতা ভেঙে আত্মোপলব্ধির আলোকে আলোকিত হল। ফলে পরবর্তী প্রতিটি সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা হয়ে উঠল তার সঞ্জীবনী-শক্তি। জাতীয় জীবনের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে আবু জাফর শামসুদ্দীনের মতো যেসব বুদ্ধিজীবীমানস সর্বদা একাত্ম, ভাষা আন্দোলন তাদের জন্যও নবতর চিন্তাশক্তির উৎস হয়ে উঠল। এ-সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধই তার প্রমাণ।

১৯৫৪ সালে লিখিত 'রাষ্ট্র ও ভাষা' ('সোচ্চার উচ্চারণ'-এ অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্র ও ভাষার নিরপেক্ষ—অস্তিত্ব, উদ্ভবের স্বতন্ত্র ইতিহাস প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানব প্রজাতির উদ্ভবের প্রারম্ভলগ্নে প্রাগৈতি-হাসিক যুগে তার জৈবিক প্রয়োজনে ভাষার উৎপত্তি। অন্যদিকে রাষ্ট্র বিষয়ক চেতনাটি একান্তই আধুনিক কালের ইতিহাসের বিষয়। পাকিস্তানী শাসক-শক্তি কর্তৃক রাষ্ট্র ও ভাষার প্রশ্নটিকে সংযুক্ত করে সৃষ্ট বিভ্রান্তির যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা উপস্থাপিত হয়েছে এ-প্রবন্ধে।

'ভাষার ভূমিকা' ও 'বর্ণমালা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধদ্বয় ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) একই সময়ে (অক্টোবর ১৯৬৮) রচিত। উভয়

প্রবন্ধে আমাদের মাতৃভাষার বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি ভাষাবোধ সম্পর্কিত বিশদ বিশ্লেষণ বিন্যস্ত হয়েছে। ভাষা সম্পর্কিত কূপমণ্ডূকতা বিমোচনকল্পে তিনি প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা ব্যবহারের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে উদাহরণ আহরণ করে বিভ্রান্তির বিভিন্ন প্রান্ত চিহ্নিত করেছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর উপসংহারমূলক সিদ্ধান্ত :

> শব্দ সমকালীন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শব্দের জাত-কুল-সংস্কৃতি-ধর্ম নেই। উৎপত্তিকালে কোন্ শব্দ কোন্ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতো তাও সঠিক জানার উপায় নেই, কেননা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যাবৃত। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সাথে সাথে ভাষাও বিবর্তন লাভ করে এবং শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়—[৩৩]

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ উচ্চারণ লক্ষণীয়।

'একুশে ফেব্রুয়ারী : পুনর্মূল্যায়ন'[৩৪] শীর্ষক প্রবন্ধে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে 'একুশে' পালনের তাৎপর্য পরিবর্তনের বিষয়টি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-'একুশ' ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্বের প্রেরণা-উৎস, স্বাধীনতা লাভের পর সে-উদ্দীপনা-শক্তিকে জাতিগঠন কাজে নিয়োজিত করার প্রয়োজনটিই প্রবন্ধের মৌল প্রতিপাদ্য।

মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের আবেগস্পন্দিত উচ্চারণ 'আমি এবং আমার ভাষা' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ :

> আমার সংস্কৃতি, আমার আস্থা, আমার ধর্মাধর্ম ও নীতিজ্ঞান, আমার সহজতা ও সারল্য, আমার কুটিলতা জটিলতা — এমনকি আমার উপজীব্যও এই মাতৃভাষার মধ্যে বিধৃত। মাতৃভাষার মধ্যে আমার অস্তিত্ব নিহিত নিবেদিত, প্রাণবন্যায় প্লাবিত এবং পুষ্পসম্ভারে বিকশিত বিচ্ছুরিত। আলো আঁধারের পার্থক্য, জীবন-মৃত্যুর বিভেদ, জ্ঞান আজ্ঞানতার তারতম্য, প্রীতি-ভালোবাসা, হিংসা-দ্বেষ বিরোধ ও আপস, বন্ধুত্ব ও বৈরিতা আমাকে উপলব্ধি করায় আমার মাতৃভাষা।[৩৫]

২.

শিল্পনির্মাণে অনুন্নত এবং শিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ দেশসমূহে সচেতন ছাত্র-সমাজই একান্তভাবে অন্যায়-বিরোধী, প্রতিবাদে সোচ্চার এবং সত্য-উচ্চারণে নির্ভীক। ঔপনিবেশিক শাসন-উচ্ছেদে ছাত্রসমাজের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্রসমাজের অন্তর্গত বিদ্রোহী মনোভঙ্গির আরও কারণ: বৈষম্যমূলক সমাজের অনাচার সম্পর্কে, রাষ্ট্রীয় অপকৌশল ও শিক্ষা ব্যবস্থার অবমাননামূলক নীতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'সমাজ, রাষ্ট্র ও ছাত্র-অসন্তোষ'[৩৬] শীর্ষক প্রবন্ধে ষাটের দশকে এ দেশের ছাত্র-অসন্তোষের সামাজিক-রাষ্ট্রিক কারণ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন বৈষম্যে বিভক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের জনসাধারণের অস্তিত্ব থাকে এবং বিশেষত শাসক-শক্তির সঙ্গে শাসিতজনের ন্যায়নীতি, বোধবুদ্ধি, খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতির ব্যবধান হয়ে ওঠে সুদূর, তখন অন্তর্বিরোধ, বিক্ষোভ, অসংযম ও অশান্তির উদ্ভব অনিবার্য। 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়কালে রচিত 'সংস্কৃতির রূপান্তর : দেয়ালের লিখন'[৩৭] শীর্ষক প্রবন্ধে জনবিদ্রোহের উৎস হিসেবে শাসক-শক্তির ন্যায়নীতিহীন শাসনবৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে ঊনসত্তরের জনজাগরণের বৈশিষ্ট্য ও পটভূমি বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্লেষণ-সূত্রে বাঙালির অন্তর্গত বিদ্রোহী বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি সমগ্র 'পাকিস্তান'-যুগে শাসক-শক্তির গণবিমুখ শ্রেণীচরিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহের অতি অল্পদিনের ব্যবধানে রচিত হলেও 'ঊনসত্তরের গণ-বিদ্রোহ : বিশ্লেষণ ও বীক্ষণ'[৩৮] শীর্ষক এ-প্রবন্ধে লেখক এতটুকু ভাবাবেগতাড়িত নন, বরং ইতিহাস-চেতনার আলোকে আয়ত দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণপ্রয়াসী। এ জনবিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহেরই সুগভীর ব্যাখ্যায় তিনি মনোযোগী। যেমন, গণবিদ্রোহের ফলে সামরিক শাসকশক্তি যখন আইয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়াকে ক্ষমতাসীন করল, নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিল, এবং ইয়াহিয়া অসন্তোষ প্রশমনের কৌশল হিসেবে সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিল, তখন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। অথচ জনগণের দাবি ছিল অনেক, এ সামান্য আদায়ে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক নয়। লেখকের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> জনগণ সংগ্রাম ত্যাগ করেনি। সেই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তা-দিগকে দিয়ে যে কোনোরকম ত্যাগ স্বীকার করানো যেতো।

> তাদিগকে পশ্চাৎ হতে রশি টেনে থামিয়ে দেয় মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব। সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে কুলি মজুর এবং গরীবদের নিয়ে গঠিত সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতে শক্তি চলে যায়। ঘেরাও জ্বালাওর ভয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[৩৯]

এ-প্রবন্ধে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য, তাদের সবলতা-সীমাবদ্ধতার বৈচিত্র্যময় নানা দিকও বিস্তৃত পটভূমিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩.

বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের ঘটনাপ্রবাহ ঐতিহাসিক বিচারে অভিনবই শুধু নয়; আবেদনে বহুমাত্রিক, মহাসামুদ্রিক গভীরতাতুল্য এবং মহাকাব্যোপম ব্যাপ্তিতে স্পন্দনশীল। একটি সংবেদনশীল মন যখন আপন অস্তিত্বের চৈতন্যসীমায় এমন সহস্রাব্দকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রলয়ঙ্করের পাশাপাশি নবসৃষ্টিস্পন্দী ঘটনাস্রোত প্রত্যক্ষ করে, তখন আলোড়িত, রক্তাক্ত ও সৃষ্টিসুখে উল্লসিত না হয়ে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত লেখকের তিনটি প্রবন্ধই ('সোচ্চার উচ্চারণ'-এ সঙ্কলিত) এরূপ অনুপ্রেরণার ফল।

'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি জাতি গঠনে ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান এবং জনমানসে এ-সংক্রান্ত সচেতন উপলব্ধিই যে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত একটি অব্যাহত প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিচালিত করেছে তারই স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক যথার্থভাবে উপসংহারে উপনীত হন যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের "বীজ ১৯৪৮ সালে রোপিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সালাম বরকত প্রমুখ তরুণের পূত পবিত্র রক্তে সিঞ্চিত হয়ে প্রথম অঙ্কুরিত হয়।"[৪০] একজন সাহিত্যসাধক হয়েও এ-ধরনের একান্ত রাজনৈতিক ভাবনায়ও আবু জাফর শামসুদ্দীনের চিন্তাধারা সংযত, ঋজু ও অনুভববেদ্য।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় রেনেসাঁর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তনধারাকে সর্বতোভাবে সফল, সমাজমানসে দৃঢ়মূল ও আবেদনে দূরসঞ্চারী করার জন্য অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের

প্রয়োজন হয়, তার অনুপস্থিতিই স্বাধীনতা-উত্তর অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত ঘটনাপ্রবাহের কারণ। মহৎ প্রতিভার দূরদর্শিতা ধারণ করেন বলেই তিনি এ-ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে বিশুদ্ধভাবে চিহ্নিত করে ১৯৭৪ সালে নিম্নোক্ত পরিণামসঞ্চারী মন্তব্য প্রদানে সক্ষম হন:

> বাংলাদেশে প্রকৃত রেনেসাঁ হয়নি। শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটাও বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। শুরুতেই তার মূলোৎপাটন না করতে পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।[৪১]

'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি আবেগ-দীপ্ত। রবীন্দ্রচেতনা আমাদের মুক্তিপ্রেরণাকে কিভাবে আন্দোলিত, উদ্দীপিত ও গতিশীল করেছে, তারই আবেগস্পন্দিত অভিপ্রকাশ ঘটেছে এ-প্রবন্ধে। একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ,

> আমরা পথ হারিয়েছিলাম। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনলেন কবি। পৃথিবীতে এমন ক'টি দৃষ্টান্ত আছে যে, একজন কবি একটি জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। যতই একথা ভাবি ততই অভিভূত হই এবং বারবার স্মরণ করি সেই কবিকে যার আহ্বানে আমরা আমাদের 'পুরনো নাম' বিসর্জন দিয়ে "নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়" আরোহণ করলাম।[৪২]

৪.

পাকিস্তান নির্মাণের প্রারম্ভলগ্ন থেকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস ভাষার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেও জিজ্ঞাসাদীর্ণ হয়েছে। যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানে তার বিলম্ব হয়নি, কিন্তু শাসক-শক্তি ও তাদের অনুচর-বর্গের বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকৌশলের ফলে সমগ্র 'পাকিস্তান' কালপর্ব জুড়ে, এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশেও, এ-বিষয়ের বিতর্ক থামেনি। আবু জাফর শামসুদ্দীনের আরও বহু প্রবন্ধের মধ্যে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ'[৪৩] এ-রূপ বিতর্কেরই এক মীমাংসিত উচ্চারণ। প্রবন্ধটিতে বাঙালি মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ না ঘটার ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে: (১) ইসলাম "ধর্মের মূলমন্ত্র ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ বিরোধী"[৪৪]; (২) "মাতৃভাষার ব্যাপারে অন্ততঃ সকল বর্ণের হিন্দু একমত" হলেও "মুসলমান তার মাতৃভাষার ব্যাপারেও একমত ছিল

না"[৪৫]; (৩) আশরাফ-আতরাফে বিভক্ত "বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়সুলভ ঐক্যও ছিল না"[৪৬]; (৪) "অবাঙ্গালী নেতৃত্বের মন ও মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাব ছিল"[৪৭]; (৫) "ওয়াহাবী আন্দোলনও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত না হওয়ার জন্য দায়ী"[৪৮]; (৬) "আলীগড় আন্দোলনও বাঙ্গালী মুসলমানকে কম বিভ্রান্ত করেনি", সেখানে "ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো বটে কিন্তু ইংরেজ জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ছিল সেটা শিক্ষা দেয়া হতো না"[৪৯]; (৭) ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু নেতৃত্বেরও বহু ভুল ছিল। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা আত্মস্থকারী তরুণ বাঙালি মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি সঠিক ধারার উন্মেষ ঘটে, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এ-প্রবন্ধে লেখকের বিশ্লেষণীদৃষ্টি বিষয়ের মর্মমূলে প্রোথিত।

পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় পাকিস্তানী-আদর্শের পুরনো প্রশ্নগুলো উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। 'ধর্মচিন্তা, জাতিচিন্তা এবং রাষ্ট্রচিন্তা'[৫০] শীর্ষক প্রবন্ধটি এ নতুন পটভূমির সৃষ্টি। প্রবন্ধটিতে শিরোনামাভুক্ত ত্রিরূপ চেতনা-সূত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জাতিগত চেতনা সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পূর্ণতঃই ধর্মনিরপেক্ষ। "সম্ভবতঃ গোষ্ঠী এবং পরিবেশ চেতনারই সম্প্রসারিত ও পরিমার্জিত রূপ জাতি-চেতনা"[৫১]। অন্যদিকে "রাষ্ট্র ইহলোকের মানুষের কল্যাণ করার জন্যে মানব-সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান।... রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী নকশা নেই, চিরস্থায়ী নীতিমালাও নেই। ধর্মের রূপরেখা ও বিধিবিধান অপরিবর্তনীয় : পরিবর্তন করার অধিকার মানুষের নেই।"[৫২] ধর্মভিত্তিক জাতি বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এ-গ্রহে নেই, অথচ একজাতিক কিংবা বহুজাতিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ যেমন বহু একজাতিক রাষ্ট্রে বাস করছে, তেমনি এক ভাষাভাষী অথচ নানা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষও একজাতিক রাষ্ট্রে বাস করছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের নিয়েও বহু রাষ্ট্র সার্থকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ-ত্রিরূপ চেতনা-সূত্রের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা ছাড়াও প্রবন্ধটিতে পশ্চাদ্‌মুখী চিন্তাধারার পরিণতি বিশ্লেষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর উপসংহারমূলক মন্তব্য :

> পশ্চাদ্ধাবন নয়, মূর্খতা সম্প্রসারিত করে সঙ্কট ঠেকিয়ে রাখা অথবা কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও নয়, সাহস ও সততার সাথে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।[৫৩]

'জনতা, স্বাধীনতা এবং জাতি'[৫৪] শীর্ষক প্রবন্ধটি স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় জীবনে উদ্ভূত একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা। জনতা অর্থে এখানে একটি জাতির সুশৃঙ্খল সুপরিকল্পিত গঠনমূলক আচরণের বিপরীতধর্মী স্বতঃস্ফূর্ততাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনগণের এরূপ জনতাধর্মী আচরণ একটি স্বাধীন জাতিগঠনে সহায়ক নয়। প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যাদর্শের অভাবজনিত সীমাবদ্ধতার সত্যকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্মোচন করা হয়েছে। যদিও জাতি হিসেবে আমাদের সুষ্ঠু বিকাশের প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিরাট সুযোগের দ্বার অর্গলমুক্ত করেছে,

> বিগত কয়েক শ' বৎসরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানুষ একটি জাতিরূপে সদর্থক (পজিটিভ) কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলো। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাসকারী এক ভাষাভাষী এই জনসমষ্টি তার ইহলৌকিক ভাগ্যকে এক ও অভিন্ন এবং অবিভাজ্য বিবেচনা করবে, তবেই হবে সে একটি জাতি।[৫৫]

কিন্তু জনতাধর্মী আচরণ দিয়ে এ-জাতিগঠন প্রক্রিয়া কিংবা স্বাধীনতাকে সুসংহত ও অর্থবহ করে তোলা সম্ভব নয়। শিরোনামাভুক্ত তিনটি বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে এক বৃহত্তর সত্য বিশ্লেষিত হয়েছে এ-প্রবন্ধে।

'বাঙ্গালী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য'[৫৬] প্রবন্ধে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টিকে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করার কারণ, "মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম বাঙ্গালী আলাদা জাতিসত্তা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বাঙ্গালী গঠন করেছে তার নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।"[৫৭] বাঙালির কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য এরূপ কৃতিত্ব অর্জনে তাকে সক্ষম করল, অতঃপর তা অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে প্রাবন্ধিক যথার্থই প্রত্যক্ষ করেছেন যে, "কোমলতা ও কাঠিন্য, ভাবাবেগ এবং দৃঢ় সঙ্কল্পে অবিচলতা" প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বাঙালি যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ দ্বারা অধিক পরিচালিত, কিন্তু সে ভাবাবেগ দীর্ঘস্থায়ী নয়, দ্রুত

ফললাভে আগ্রহী, যৌথ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনড় অটল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত, পরাজয় মানতে অস্বীকৃত, গ্রহণ-বর্জন উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত মত পরিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। এসব বৈশিষ্ট্যকে সদর্থক ধারায় পরিচালিত করে জাতির কল্যাণ সুনিশ্চিত করার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে এ-প্রবন্ধে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শাসক-শক্তি যখন ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে যুবসমাজকে স্বীয় স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রয়াস পায়, তখন তা সমগ্র জাতির জন্য অমঙ্গলজনক হয়ে ওঠে। 'যুবসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তা'[৫৮] প্রবন্ধে আবু জাফর শামসুদ্দীন এরূপ নীতির পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। জাতি অর্থে বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর এমন একটি ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্বকে বোঝায়, যার মূল লক্ষ্য ও আদর্শ অভিন্ন। সুতরাং জাতির একাংশের সঙ্গে অপরাংশের মেরুদূর সম্পর্ক বিপজ্জনক। তৎকালে প্রবীণ ও নবীনদের চিন্তা ও কর্মে যে-ব্যবধান সূচিত হয়েছিল, তা জাতিকে বিভক্ত করে ফেলে—যার পরিণতি পঁচাত্তরের পরিবর্তন—এক বছর পূর্বেই তিনি এ-সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি এমন একটি সামগ্রিক মূল্যবোধ, যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রা এবং জাতীয়তাবোধ। তৃতীয় উপকরণটি প্রথম দুটির সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের এ পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী এ-সংক্রান্ত বিতর্ক ও প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে 'গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ'[৫৯] শীর্ষক প্রবন্ধে।

'জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র এবং প্রশাসনিক কাঠামো' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে সঙ্কলিত) শীর্ষক প্রবন্ধে এ-সম্পর্কিত লেখকের পূর্ব-অভিমতসমূহই নবরূপে বিন্যস্ত হয়েছে। এবং এ-সূত্রে ইসলাম ধর্মের সীমাবদ্ধতা এবং ঐ ধর্মের প্রচারসর্বস্ব শক্তিসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট নানা বিভ্রান্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ, তথ্যনিষ্ঠ ও ইতিহাসসংলগ্ন। ইসলাম ধর্মের কোনো রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাঠামোগত রূপরেখা নেই এবং ইসলাম ধর্ম ভৌগোলিক সীমারেখায় বিকশিত জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাজাত্যবোধের মধ্য দিয়েই

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার উন্মেষ ঘটেছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র-কাঠামো স্বাধিকার সংগ্রামেরই পরিস্রুত ফল। এর প্রশাসনিক কাঠামোকে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কল্যাণ-উপযোগী করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন অভিব্যক্ত হয়েছে এ-প্রবন্ধে।

৫.

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এক চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল সামাজিক পটভূমিতে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানসে মূল্যবোধের যে-সঙ্কট ঘনীভূত হয়, তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে 'সমাজ-চেতনা বনাম মূল্যবোধ'[৬০] শীর্ষক প্রবন্ধে। সঙ্কটের কারণ নির্দেশ করে তিনি বলেন, "১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ এবং তার পরবর্তী পঁচিশ বছরের ইতিহাস অজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের অবনতির ইতিহাস।"[৬১] এ-প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত: "সংকট আসলে চেতনার অভাবের, মূল্যবোধের সংকট সেই বিষবৃক্ষের ফলমাত্র।"[৬২]

চেতনার অভাব ও পশ্চাদ্‌পদ মানসিকতার কারণেই বহুবিধ অবাঞ্ছিত প্রশ্ন আমাদের সমাজজীবনে উত্থিত হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবধানের স্বরূপ উপলব্ধিও এরূপ প্রশ্নের অংশ। সভ্যতার স্পর্শ থেকে দূরে এমন জনগোষ্ঠীরও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে, রয়েছে তাদের আচার-আচরণ-উচ্চারণের নিজস্ব রূপ ও ভঙ্গি। সভ্যতা এ-সংস্কৃতিরই উন্নত ও পরিমার্জিত রূপ। সংস্কৃতির পরিমার্জনার ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন ধারার আন্তর্ক্রিয়ার বিষয়টি অন্যতম পূর্বশর্ত। ফলে প্রতিটি সভ্যসমাজ তার নিজস্ব সংস্কৃতি বলে যাকে গণ্য করে তার মধ্যে পরিচিত-অপরিচিত, আধুনিক অনাধুনিক নানা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিকন্তু পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এ আন্তর্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিও ক্রমবিবর্তনশীল।

নাতিদীর্ঘ হলেও 'ইতিহাস কি, কেন এবং কার জন্যে?' ('সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধে ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন সংক্রান্ত ইতিহাসের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন ব্যক্ত হয়েছে।

একটি সমাজে স্বার্থপর-চিন্তা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তীব্ররূপ ধারণ করলে তার পরিণতি মারাত্মক। স্বার্থচিন্তার পাশাপাশি সামগ্রিক কল্যাণচিন্তার

বিষয়টি একটি সমাজের অগ্রগতির জন্য আবশ্যক। সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনা ও বিকাশের জন্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এবং স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রে শাসকদল ও বিরোধী গোষ্ঠীসমূহ উভয়েরই সমান ভূমিকা থাকা কর্তব্য। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার সার্থকতা বিবেচনায় এসব যুক্তিই উত্থাপিত হয়েছে 'সমাজ ও তার সংগঠন' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত) প্রবন্ধে।

৬.

'জাতীয় ইমেজ'[৬৩] শীর্ষক প্রবন্ধে সুগভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমির আলোকে আদর্শ ও নেতৃত্বের ভাবমূর্তি সৃষ্টির যথাযথ উপাদানসমূহের অনুসন্ধান করা হয়েছে। পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতার কারণে এসব উপকরণেরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে একদা ধর্মপ্রচারকগণ ইমেজ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক যুগে সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় নেতৃত্বকে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

> নেতৃত্বের ইমেজ সৃষ্টির যে একমাত্র উপাদান অবশিষ্ট থাকে তা হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সর্বপ্রকার আঞ্চলিক ও আন্তরাঞ্চলিক অসামঞ্জস্য, দৃষ্টিকটু বিভেদ এবং শোষণমূলক অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যিকার জেহাদ ঘোষণা।[৬৪]

প্রকৃত ইমেজ সৃষ্টির জন্য নেতৃত্বকে অবশ্যই সঙ্কীর্ণ-স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে যেকোনো একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙক্ষা-স্বপ্নের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য জাতীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠাকারী নেতৃত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অবস্থানকে তিনি ইমেজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফল বলে বর্ণনা করেন। তবে তাঁর এ মূল্যায়ন বিতর্ক-উর্ধ্ব নয়।

'অতীত নেতৃত্ব' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত) শীর্ষক প্রবন্ধে জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে এবং আমাদের দুজন জাতীয় নেতা সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য আবেগহীন মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলার জননন্দিত এ. কে. ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে গণকল্যাণমুখিতা থাকলেও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার

অভাবের ফলে তাঁদের ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশগত হওয়া এ ভ্রান্তিরই ফল।

> ১৯৩৭-৪৬ সালের ভ্রান্ত নেতৃত্বের মাশুল শুধু নেতাদেরকেই দিতে হয়নি, বাংলাদেশের জনসাধারণকেও খুব বেশী করেই দিতে হয়েছে। মাত্র ২৪ বৎসরকাল পরে তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমাদিগকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন হতে হয়েছে। বিভ্রান্ত নেতৃত্বের দ্বারা অধিকতর বিভ্রান্ত সে-যুগের জনতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চব্বিশ বছর পরের জনতাকে করতে হলো।[৬৫]

ব্যক্তির ভুলে ক্ষতি হয় ব্যক্তির, কিন্তু নেতৃত্বের ভ্রান্তি সমগ্র জাতির অকল্যাণের কারণ হয়। এ-প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গত এ-যুগের বিভ্রান্তসৃষ্টি-কারীদের—"পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না"—এধরনের কুযুক্তিকে খণ্ডন করেন এভাবে,

> পাকিস্তান না হলে ভারত বিভাগ হতো না। ভারত বিভাগ না হলে বিভাগের সময় কমপক্ষে ৫০ লক্ষ লোক মরতো না। দ্বিতীয়-বার স্বাধীনতা লাভ করার কালে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীও নিহত হতো না।[৬৬]

এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবের কথা মনে রেখেও তিনি তাঁর ইতিবাচক গুণাবলী আমাদের জাতীয় উন্নয়নধারায় যে ঐতিহাসিক অবদান সৃষ্টি করেছে, তা যথাযথভাবে উন্মোচন করেন। 'বাংলার মহা-কাব্য ফজলুল হক' ('সোচচার উচচারণ' গ্রন্থভুক্ত) এবং 'এ কে ফজলুল হক' ('সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাগ্রহণ ও চাকরি-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সহায়তাদান ছাড়াও জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রসারসাধন ও দরিদ্র-শ্রমজীবী কৃষককুলের পক্ষে আইন গ্রহণ থেকে শুরু করে গভীর সহানুভূতি ও মমত্ব নিয়ে তাদের হৃদয়ে ঐতিহাসিকভাবে যে-আসন করে নেন, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধ্বংস ও নির্মাণের এক কোলাহলপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনে রাজা রামমোহন রায়ের সচেতন ও দূরপ্রসারী উদ্যোগসমূহ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় জীবনে এমন ঐতিহাসিক ভূমিকা

পালন করার কারণেই তিনি প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণীদৃষ্টির বৃত্তাধীন হয়েছেন। তাঁর স্মরণীয় হওয়ার কারণ, তিনটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য: জাতির সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা, আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারসাধনে বলিষ্ঠ উদ্যোগ এবং ধর্মীয় সমন্বয় ও সংস্কারের মাধ্যমে আত্মিক মুক্তি ও ঐক্যের প্রয়াস। বৃটিশ উপনিবেশবাদের দৃঢ় সমর্থক হয়েও রাজা রামমোহন রায় কিভাবে সমগ্র জাতির মঙ্গলসাধনে তার সকল শ্রম ও মেধাকে সাধকের নিষ্ঠা দিয়ে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হলেন, তারই দ্বন্দ্বাত্মক মূল্যায়ন 'রাজা রামমোহন রায়'[৬৭] প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। রামমোহন রায়ের অবদান বিচারে লেখকের প্রসারিত-দৃষ্টি সত্য উন্মোচনে সফল।

৭.

প্রকৃত অর্থে লোকসংস্কৃতি একটি জাতির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের মধ্যেই জাতীয় সত্তার বিশুদ্ধ রূপ অনুসন্ধেয়। আবু জাফর শামসুদ্দীন আমাদের লোকসংস্কৃতির অন্তর্সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে এক মহৎ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন: "শুধু বাংলার নয় পৃথিবীর সকল অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিই প্রকৃতপক্ষে সব সত্যের সমন্বিত রূপ।"[৬৮] 'বাঙালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি' ('লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি আমাদের জাতির আত্মপরিচয় তথা লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকল্পে যে গবেষণাধর্মিতা, ইতিহাসসচেতনতা, আধুনিক সমাজবোধ এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ আয়ত দৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন, তা প্রশংসনীয়। এ-অঞ্চলের আবহাওয়া, নিসর্গ ও মৃত্তিকাগুণ, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন পদ্ধতি ও উপকরণ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়-মানসতা, সামাজিক সহনশীলতা ও বিদ্রোহ প্রভৃতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পটভূমি উপস্থাপনের আলোকে এ-প্রবন্ধে মৌল প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লেখকের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিন্যস্ত হয়েছে। আধুনিক ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা ও গভীরতর মননশীলতায় প্রবন্ধটি ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। লেখকের গবেষণাজাত কতক উপলব্ধি নবতর চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

লোকসংস্কৃতির উর্বর উদ্ভব ও সমন্বয়কাল হিসেবে বৃটিশশাসন-পূর্ব সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনযুগকে চিহ্নিতকরণের মধ্যেই লেখকের সামগ্রিক সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস সার্থকতা লাভ করে। তাঁর যুক্তিসিদ্ধ উপলব্ধি:

> মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে একটি অবিভাজ্য জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে এবং তার জাতীয় লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যও ক্রমে ক্রমে সৃজিত ও পূর্ণতালাভ করছে। এই সাড়ে পাঁচশত বৎসরকালকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির বৈপ্লবিক যুগ বলা যায়।...এই সাড়ে পাঁচশত বৎসরকালকে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক সমীকরণের যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না।... মুসলিম শাসনামলে সৃজনশীল বাংলার লোক-সংস্কৃতি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের যৌথ কর্মজীবন এবং সামাজিক চিন্তার ফসল: তাদের নানা বিচিত্র এমনকি কখনও কখনও পরস্পরবিরুদ্ধ ধ্যান ধারণার সিনথিসিস।[৬৯]

মূলগতভাবে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এ সমন্বিত "লোকসংস্কৃতি যেহেতু সমাজ-মৃত্তিকা হতে উদ্ভূত, সেহেতু দ্বন্দ্ব ও বিবর্তনক্রিয়ার মধ্যে সমাজের যে অগ্রাভিযান চলছে, তার সঙ্গেও লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক"[৭০] থাকায় তা মৌলচরিত্রে যে বিবর্তনশীল, এ-সত্য উচ্চারণেও লেখকের সবলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে এ সমন্বিত লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারার অন্তর্গত সীমাবদ্ধতাও উপেক্ষণীয় নয়। এতে বিশেষ কোনো ধর্মের মৌলবাদী প্রবণতা অনুপ্রবেশের সুযোগ না থাকলেও প্রেমভক্তিবাদী উপাদানের প্রাধান্য থাকায় সাধারণ লোকায়ত মানুষের মনে গণশক্তির চেয়ে ব্যক্তিক শক্তির প্রতি অধিক আস্থা জন্মলাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এ ব্যক্তিনির্ভরতা সুপরিস্ফুট হবে। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ শাসনের ফলে নগর-সংস্কৃতির উদ্ভবের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সমন্বিত মানসতার ক্ষেত্রে যে বিভেদ, অবিশ্বাস ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লোকসংস্কৃতিকেও বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে। রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটে। দীর্ঘকালব্যাপী বাঙালি মুসলিম নেতৃত্বে পশ্চিমদেশীয় অবাঙালি বকধার্মিকদের প্রাধান্য ও নীতিজ্ঞানহীন সুবিধাবাদের প্রকোপ সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। অন্যদিকে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী লক্ষ্যাদর্শগতভাবে মৃত্তিকা-বিচ্ছিন্ন, ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য দিয়ে তার উদ্ভব, মস্তিষ্কে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

জন্মজন্মান্তরের দাসত্ববোধ। আমাদের সমন্বিত লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য, আমাদের যুগযুগান্তরের মুক্তিকামী বিদ্রোহী বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসনের ফলে উদ্ভূত এসব নবতর উপাদান আমাদের প্রগতি ও অগ্রগতির পথে এক আপাত-দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। 'সমাজবিজ্ঞান ও বাঙালী সমাজ' ('লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক মৌল প্রশ্নের উত্তর উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়ে উপর্যুক্ত উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। লেখকের গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণীদৃষ্টি যেমন আমাদের সমাজ, জীবনধারা ও ইতিহাসের গভীর মর্মমূলে প্রসারিত, তেমনি পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের রক্তক্ষয়ী স্বাধিকার সংগ্রাম, এবং ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণ-বিসর্জনকারী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হলেও, চার বছর অতিক্রান্ত না হতেই কেন সেসব রক্ত-অর্জিত মূল্যবোধ রাষ্ট্র ও সমাজজীবন থেকে ক্রমশ ক্ষয় পেতে শুরু করল—তার কারণ নিয়ে জাতির কল্যাণকামনায় উদ্দীপ্ত ও দায়িত্বসচেতন প্রতিটি বিবেকবান বাঙালিকেই চিন্তান্বিত হতে হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীনের এ-প্রবন্ধ তেমন চিন্তারই সার্থক ফল, এবং জাতীয় দায়িত্ববোধের পরিচয়বাহী।

ধর্ম

ধর্মাচ্ছন্নতা ও ধর্মবোধ সমার্থক নয়। ধর্মাচ্ছন্নতা দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ, অপরিচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে। পক্ষান্তরে সংস্কার-মুক্ত আধুনিক জীবনদৃষ্টিতে ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ উপলব্ধিই ধর্মবোধের পূর্ব-শর্ত। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মাদ্রাসাশিক্ষিত হয়েও আবু জাফর শামসুদ্দীনের ধর্ম-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পক্ষপাতশূন্য ও আবেগমুক্ত। ইসলাম ধর্মের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিক, তার উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমি ও ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান এবং তা বিচারের নিরাসক্ত দৃষ্টিই মূলত এ-সম্পর্কিত সত্য উদ্‌ঘাটনে তাঁকে সাহায্য করেছে। বাঙালি মুসলিম মানসে ধর্ম সম্পর্কে যে নানারূপ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার বিদ্যমান, অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক অপপ্রচারই তার প্রধান কারণ। ধর্মবিষয়ক রচনাসমূহে তিনি এ বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ও সচেতন।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে প্রকৃত ইসলামের অবস্থিতি সম্পর্কে, আরবি ভাষার ধর্মীয় পবিত্রতা সম্পর্কে এদেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানসে যে-ভাবাবেগপ্রসূত অজ্ঞতা ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের মোহ বিরাজমান, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থেই তার অপসারণ আবশ্যক। 'মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও ইসলাম' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের নামে ঐ অঞ্চলের শাসক-শক্তিসমূহের ইসলামবিমুখ, কায়েমী-স্বার্থপুষ্ট, জনকল্যাণবিরোধী মানসতাকে ইতিহাস ও সমকালীন কর্মকাণ্ডের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। মক্কা নগরীর কাবাগৃহ সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিম মানসে যে পবিত্রতাবোধ ক্রিয়াশীল, তা সমগ্র সৌদি আরবকে পুণ্যভূমি-কল্পনায় আচ্ছন্ন। অথচ ইসলামী হুকুমতের পরিবর্তে সৌদি আরবে চলছে রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসন, যা পূর্ণায়তভাবে ইসলামের চেতনাবিরোধী।

> সৌদী রাজ্যে সাধারণ মানুষের কোনরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার এবং স্বাধীনতা নেই। সৌদী রাজ্যের কোন লিখিত সংবিধান নেই। সেখানে নির্বাচন হয় না। তাই বিরোধী দল নেই। স্মরণীয় যে, একদলীয় শাসন প্রথায়ও নির্বাচন হয়। সে দেশে রাজনৈতিক মতবিরোধ বরদাশত করা হয় না। তাই বিরোধী দল, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র প্রভৃতি থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সেদেশে ট্রেড ইউনিয়ন নেই। নীতি, আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যে জনগণকে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার প্রচেষ্টা সেদেশে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এমন কি জাতীয়তাবাদী চেতনাও সেদেশে নেই। আচার-বিচার, শাসন-সবকিছুই সৌদী রাজ-পরিবারের খেয়ালখুশী অনুযায়ী চলে। সৌদী আরব প্রকৃতপক্ষে সৌদী রাজ-পরিবারের সম্পত্তি, অর্থাৎ একটি বিশাল জমিদারি।[৭১]

শুধু সৌদি আরবের নয়, ইরাক, ইরান, জর্দান, মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নামে ইসলাম থাকলেও ঐসব দেশের শাসকশ্রেণীর জনগণ-বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর নীতির কারণে দেশগুলো প্যালেস্টিনীয় সমস্যাসহ মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য সংকট সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হতে পারছেনা।

> মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সর্বগ্রাসী ইসরাইলী তথা মার্কিন আধিপত্যের মূলে রয়েছে গণবিপ্লবের ভয়ে সতত: সন্ত্রস্ত ঐ অঞ্চলের স্বৈরাচারী

> ক্লায়েন্ট শাসকশ্রেণী। মোনাফেকি করার জন্যই ওরা পবিত্র ইসলাম ধর্মের নাম করেন।[৭২]

এ-অনৈক্যের পাশাপাশি প্যালেস্টাইন সমস্যা অব্যাহত থাকার অন্যতর মূল কারণ সাম্রাজ্যতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র। জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এরূপ চক্রান্তেরই ফল। সুদূর অতীত থেকে ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো বৈরিতা ছিল না, বরং ইহুদী নিধনে সর্বদা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে খ্রীষ্টান-বিশ্ব। অথচ খ্রীস্টান-বিশ্বের সহযোগিতায় প্যালেস্টিনীয় ও আরব মুসলমানদের ওপর ইসরাইলী ইহুদীরা বর্তমানে চরমতম সংঘাত পরিচালনা করছে। অতএব লেখক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সমস্যার মূলে ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়; বরং সাম্রাজ্যতন্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ ও আধিপত্য অব্যাহত রাখার অভিলাষই এক্ষেত্রে মুখ্য উপাদান। 'প্যালেস্টাইন সমস্যা' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের এ-অন্তর্সত্য উদ্ঘাটনে লেখকের যুক্তিশীল লেখনী ইতিহাস-অন্বেষী। তবে এ-প্রবন্ধে আবু জাফর শামসুদ্দীন প্যালেস্টিনীয়দের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এমনই একাত্ম-যে তাঁর বিশ্লেষণ সর্বতোভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। সাম্রাজ্যতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের শিকার ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাইল আজ নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ—এটি গত চার দশকের সত্য। কিন্তু তার পূর্বে ঐ দেশটির জনগণও যে বংশপরম্পরায় মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে, সারা বিশ্বে উদ্বাস্তু থেকে ইতিহাসের ভয়াবহতম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল—সে-সত্য উচ্চারণে প্রাবন্ধিক কুণ্ঠিত।

'ধর্ম না অধর্ম' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে সঙ্কলিত) শীর্ষক প্রবন্ধে সৌদি রাজতন্ত্রের ইসলামী শাসন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জনৈক আরবীয় শাইখ-এর বিপুল অপব্যয়ী ও যৌন অনাচারী জীবন, সৌদি রাজপরিবার কর্তৃক পাশ্চাত্যের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অর্থ লগ্নী করে সুদ গ্রহণ প্রভৃতি উদাহরণ উল্লেখ করে 'ইসলামী খেদমতে'র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। সৌদি রাজতন্ত্রের ইসলাম পালন সম্পর্কে অজ্ঞ বাঙালি মোল্লাতন্ত্রকে আঘাত করার ব্যাপারে তাঁর লেখনী তীক্ষ্ণ বলেই এ-প্রবন্ধের ভাষা হয়ে উঠেছে বিদ্রূপাত্মক, কৌতুকমিশ্রিত :

> বিষয়বস্তু যাই হোক—এমনকি পর্নোগ্রাফি হলেও আরবী পুস্তক দেখলেই আমরা সেটাকে বলি কেতাব।[৭৩]

এদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলো—পুঁজিতান্ত্রিক না সমাজবাদী—কোন ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তা অস্পষ্ট। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—তাদের এ দাবি, প্রাবন্ধিকের মতে, যুক্তিসঙ্গত নয়। উদ্ভবকালে কয়েক বছর, যখন ইসলামের তেমন ব্যাপ্তি ঘটেনি, তখন যে-পদ্ধতিতে শাসন করা হত, বর্তমানে তা যুগোপযোগী নয়। পরবর্তী ব্যাপ্তির যুগে ইসলামের খলিফাগণ রোমান ও ও পারস্য প্রশাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এবং বর্তমানে ইসলামী সমাজ বলে পরিচিত দেশগুলোতে কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও স্বৈরতন্ত্র, কোথাও সামরিক একনায়কত্ব প্রচলিত; তবে কোথাও উদ্ভবযুগের ইসলামী শাসনের রূপরেখা নেই, বরং মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ শাসকই সাম্রাজ্যতন্ত্রের অনুসরণে তৃপ্ত এবং অনৈসলামিক কর্ম সাধনে ব্রতী। 'ধর্ম ও কর্ম' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধে তাই তিনি এদেশের ধর্মীয় রাজনীতিকগণ কোন ধরনের ব্যবস্থা কায়েমে সঙ্কল্পবদ্ধ তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন। "অস্পষ্টতার মতো ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই"—এ-রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসে স্থিত বলেই লেখক অস্পষ্টতার অবসান কামনা করেন।

সমাজের শ্রেণীবৈষম্যকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলে ব্যাখ্যাদানকারী-গণ মূলত ধর্মব্যবসায়ী, শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিংবা তাদেরই স্বার্থ-রক্ষক। 'নববর্ষে' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধে এ-ধরনের ধর্মজীবীদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে: সকল সম্পদের মালিকানা স্রষ্টার, অপব্যয়-অপচয়কারীরা অভিশপ্ত ইবলি-শের গোত্রভুক্ত, সম্পদের পুঞ্জীভবন নিষিদ্ধ, সর্বনিম্ন প্রয়োজনের অতি-রিক্ত সবকিছু উদ্বৃত্ত এবং তা স্রষ্টার উদ্দেশে ব্যয় করা আইনত সিদ্ধ। অথচ শোষক-শক্তি পরবর্তীকালে এ সবকিছুর ব্যাখ্যা করেছে স্ব-স্বার্থে।

শিশু একাডেমীর 'জ্ঞানের কথা' গ্রন্থে নবী ও ধর্মপ্রচারকদের ক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনকারীগণ যে মূলত ভণ্ড মোনাফেক এবং মূর্খতা লালনকারী, আবু জাফর শামসুদ্দীন তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন 'একুশের ভাবনা' ('মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজ-নীতি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক প্রবন্ধে। 'দোয়া গঞ্জল আরশ' নামক ইসলামী গ্রন্থে "আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, ঈসা এবং সর্বশেষে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দঃ)। স্কুলপাঠ্য দীনিয়াত পুস্তকেও নবীদের বেলায় উক্ত অনুক্রম রক্ষিত আছে। কোরান শরিফেও সকলের আগে আদম (আঃ)-এর নাম।"[৭৪]

ঐতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে—এমন ধারণা কেবল জ্ঞানপাপী কিংবা মূর্খেরই কল্পনা।

'ইহজাগতিকতা' ('লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধটি লেখকের দীর্ঘকালব্যাপী সুগভীর চিন্তা, নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ, প্রচুর পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, পারলৌকিকত্ব ও ইহজাগতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ককে সভ্যতার অগ্রযাত্রা ও ইতিহাসের পটভূমিতে বিবেচনা করে লেখক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "ধর্ম-বিশ্বাসের প্রথম সূচনা ইহজাগতিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জৈব বাসনা হতেই।"[৭৫] এ-প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতার উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও গ্রীস-রোমের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-নিরপেক্ষবোধের অন্তর্সত্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিকতা-উৎসারী এ-অনুসন্ধিৎসা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগান্তকারী অগ্রগতিসাধক ইউ-রোপীয় সভ্যতার প্রেরণাউৎসকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে অবলোকনে তাঁকে সক্ষম করেছে :

> সমষ্টিগতভাবে মানুষের ইহজাগতিক সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করে মানুষকে পারলৌকিক পাথেয় সংগ্রহ করার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছে ইয়োরোপ। ইয়োরোপ-আমেরিকার মানুষ ধর্মত্যাগ করে সবাই নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী হয়ে যায়নি; ধর্মকে রাষ্ট্র হতে পৃথক করেছে মাত্র। তার ফলে ধর্ম বহু রকমের অনাচারমুক্ত হয়ে তার মৌলিক মানব-কল্যাণকামী চরিত্র ফিরে পেয়েছে।[৭৬]

সুতরাং ধর্ম নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাই আধুনিক সভ্যতা ও অগ্রগতির পূর্ব-শর্ত—আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এ-সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইহজাগ-তিকতাকে তিনি যুক্তি ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একান্তভাবে মানব-কল্যাণকর আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এবং "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥"—বাঙালি কবির এ-উক্তির মধ্যেই ইহজাগতিকতার সকল ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ-বাক্যের অন্তর্নিহিত আবেদন তাকে এমনই আলোড়িত, আপ্লুত ও উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এ-শিরোনামায় তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। 'ইহজাগতিকতা' ও 'সবার উপরে মানুষ

সত্য' ('লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে সঙ্কলিত) প্রবন্ধদ্বয়ে আবু জাফর শামসুদ্দীনের মানবিকতাবোধ চূড়াস্পর্শী। কবি চণ্ডীদাসের এ-উক্তির পাশাপাশি গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাসের আড়াই হাজার বছর পূর্বের বিখ্যাত উক্তি—"মানুষই সবকিছুর মানদণ্ড"—এবং পোপের উক্তি-"মানবজাতিকে ভালোভাবে জানার উপায় মানুষ"—স্মরণ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে মানবসমাজকে জানা, তার শক্তি উপলব্ধি, নিসর্গের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে তাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের জ্ঞানচর্চার লক্ষ্য।

'ইহজাগতিকতা' প্রবন্ধে তিনি যেমন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করেন, পরবর্তী প্রবন্ধে তেমনি ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে মানবীয় বোধকে একাত্ম করে দেখান। কারণ, "আদি অন্তহীন অথচ সততঃ সম্প্রসারণশীল মহাজাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হলে মানুষের চিন্তা-শক্তির সীমা বেঁধে দেয়া চলে না।..."[৭৭] সর্বেশ্বরবাদ যে-স্তরে উপনীত হয়ে অদ্বৈতবাদে পরিণতি লাভ করে সেখানে ঈশ্বরে মানুষে ভেদাভেদ নেই। অন্যদিকে "যেহেতু ঈশ্বরসৃষ্ট সব বস্তুরই আদি অন্ত উদ্ভব ধ্বংস এবং জন্ম-মৃত্যু আছে সুতরাং মানব-সমাজে প্রচলিত সমস্ত প্রথা পদ্ধতি ও মতামতেরও উদ্ভব এবং অবসান আছে। (বা বিবর্তন আছে)...মানব-জীবন পরম্পরাক্রমে প্রবহমানতা। মৃত ব্যক্তির স্থান পূরণ করছে নবাগত ব্যক্তি। এই অনু-ক্রমের মধ্যে বিবর্তিত হচ্ছে মানব-সমাজের সমস্ত ইতিহাস।"[৭৮] সুতরাং এরূপ ঈশ্বরচিন্তায় মানুষের চিন্তাশক্তির অগ্রাভিযানের পথে কোনো প্রাচীর সৃষ্টির অবকাশ নেই। বাংলাদেশের শাসক-শক্তি ও ধর্মান্ধ মোল্লাতন্ত্র ইসলাম ধর্মকে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধি বলছে তা যথার্থ নয় বরং সত্যের যে অপলাপ সেটাই প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক।

তাঁর দৃষ্টিতে মানবতাবাদের অর্থ মানবকল্যাণ এবং মানবকল্যাণের অর্থ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ। তিনি মনে করেন, "আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতি পরিবর্তন ব্যতীত এ-যুগে মানবকল্যাণ সাধন অসম্ভব। বাংলাদেশের মতো স্বল্পায়তন জনবহুল প্রাকৃতিক সম্পদহীন দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে হলে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য।"[৭৯]

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রবন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যদোষ লক্ষণীয়। এর স্পষ্ট কারণ : তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাংবাদিকতার প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সৃষ্টি, যেখানে ভাষা পরিমার্জনার অবকাশ কম। তবে ভাষা-সংক্রান্ত এ-সীমাবদ্ধতা তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। সাংবাদিকতার ভাষায় লোকায়ত মানস-উপযোগী সহজ-সরলতার বিপরীতে গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভাষায় অনুশীলনধর্মী বিশ্লেষণ-স্পৃহা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য।

পূর্বাপর সমাজসংলগ্ন চিন্তায় স্থিত আবু জাফর শামসুদ্দীনের জাতিগত চেতনা, ধর্মবোধ, দেশপ্রেম, শিল্পচিন্তা, ইহজাগতিক আদর্শ, মানবিকতা প্রভৃতি সমীকৃত হয়ে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনায় পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর সংবেদনশীল শিল্পীমনের আদর্শনিষ্ঠ মানবকল্যাণ-চিন্তা ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক মানবিকতাবোধের বিশ্ববীক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ এ-রূপান্তরেরই প্রাণবন্ত দলিল।

তথ্য-নির্দেশ

১ পাঁচটি গ্রন্থের নাম নিম্নরূপ :

ক. চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য, পাকিস্তান কমিটি, কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম, ৭৪ আগা মসী লেন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬৪

খ. সোচ্চার উচ্চারণ, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

গ. সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, মুক্তধারা, ঢাকা, জুন ১৯৭৯

ঘ. মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮৫

ঙ. লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮

লেখকের "মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ" [মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮] শীর্ষক গ্রন্থটি কবি বেনজীর আহমদ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা মাত্র, ফলে প্রবন্ধ-বিশ্লেষণে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২ 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে কেবল সাহিত্য বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী এবং 'মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে শুধুমাত্র ধর্মব্যাখ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছই সঙ্কলিত হয়েছে। 'সোচ্চার উচ্চারণ' এবং 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ে সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে এবং 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ের প্রবন্ধ রয়েছে।

৩ চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৪ ঐ, পৃ. ১–২

৫ ঐ, পৃ. ২০

৬ ঐ, পৃ. ২৪

৭ ঐ, পৃ. ৪২

৮ ঐ, পৃ. ৫১

৯ ঐ, পৃ. ৬১

১০ ঐ, পৃ. ৭২-৭৩

১১ ঐ, পৃ. ৯৩

১২ ঐ, পৃ. ৪

১৩ ঐ, পৃ. ৫

১৪ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৫ ঐ, পৃ. ৫৩

১৬ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : সমকাল, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭২

১৭ প্রবন্ধটি 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ; এটি বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত ভাষণ হিসেবে রচিত।

১৮ চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৯ ঐ, পৃ. ১১৪

২০ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

২১ ঐ

২২ 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩

২৩ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

২৪ 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক বাংলা, চৈত্র ১৩৭৪

২৫ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

২৬ ঐ, পৃ. ২৩২

২৭ চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২৮ ঐ

২৯ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭১

৩০ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জুলাই ১৯৭০

৩১ চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৩২ ঐ, পৃ. ১২৪-২৫

৩৩ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৪ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ'-এ সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : জনপদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৩৫ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-৯১

৩৬ প্রবন্ধটি 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৭ প্রবন্ধটি 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৮ প্রবন্ধটি 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে রচিত ; প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি ১৯৬৯ সালের ৯ মার্চ দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী দু'সপ্তাহে আরও দু'কিস্তি প্রকাশের পর সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে পরবর্তী প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৩৯ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৪০ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪১ ঐ, পৃ. ৩৪

৪২ ঐ, পৃ. ১২৩

৪৩ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : উত্তরাধিকার, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১

৪৪ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪৫ ঐ, পৃ. ৩৭

৪৬ ঐ, পৃ. ৩৭-৩৮

৪৭ ঐ, পৃ. ৩৮

৪৮ ঐ, পৃ. ৩৯

৪৯ ঐ

৫০ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : সমকাল, জুন ১৯৭৬

৫১ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৫৪ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ নভেম্বর ১৯৭৩

৫৫ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৫৬ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ'-এ সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক পূর্বদেশ, ২৬ মার্চ ১৯৭৫

৫৭ সোচ্চার উচ্চারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৫৮ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক বাংলার বাণী, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৪

৫৯ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোরর ১৯৭৩

৬০ প্রবন্ধটি 'সোচ্চার উচ্চারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪

৬১ সোচ্চার উচ্চারণ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৬২ ঐ

৬৩ প্রবন্ধটি 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ; প্রথম প্রকাশ : দৈনিক পূর্বদেশ, ৩ মার্চ ১৯৭০

৬৪ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৬৫ ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮

৬৬ ঐ, পৃ. ৪৮

৬৭ প্রবন্ধটি 'সোচচারণ উচচারণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত ; প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯

৬৮ লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৬৯ ঐ, পৃ. ৫২-৫৩

৭০ ঐ, পৃ. ৫৯

৭১ মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৭২ ঐ, পৃ. ৩২-৩৩

৭৩ ঐ, পৃ. ৫৩

৭৪ ঐ, পৃ. ৮৮

৭৫ লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৭৬ ঐ, পৃ. ১০৬

৭৭ ঐ, পৃ. ১১৭

৭৮ ঐ, পৃ. ১১৮-১৯

৭৯ ঐ, পৃ. ১২৬-২৭